আমি,

অনাথিনী

উপন্যাস।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

১০৪ নং বিডনষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবিপিনবিহারী দে কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা
৫ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট
নূতন প্রেশে এস, সি, দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ বৈশাখ।

প্রশংসাপত্র।

আজ প্রায় ২।৩ বৎসর হইল, যোগীন বাবুর সহিত আমার আলাপ হয়। যোগীন বাবু যদিও বিখ্যাত লেখক নহেন; তথাপি ইঁহার উপন্যাস রচনায় কথঞ্চিৎ শক্তি জন্মিয়াছে। সত্যবতী প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক আমি দেখিয়াছি। তাহার সকলগুলিই যে একেবারে ভ্রমশূন্য তাহা নহে। তবে তাহার মধ্যে এক একটী স্থান আমাকে অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। সম্প্রতি "অনাথিনী" নামক পুস্তকখানি আমার নিকট লইয়া আইসেন কিন্তু আমি অসুস্থতাপ্রযুক্ত সমস্ত কাপিখানি দেখিতে পারি নাই. কেবল পুস্তকস্থিত কয়েক চরণ পদ্য পাঠ করিয়াছি. লেখা মন্দ হয় নাই. চর্চ্চা থাকিলে ভবিষ্যতে উন্নতি হইতে পারে।

২০নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,
কলিকাতা। } শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

উৎসর্গ পত্র।

—০:•:০—

পরম কল্যাণীয়, অশেষগুণ-সম্পন্ন, পিতৃপথানুবর্ত্তী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রলাল খান্ বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু।

রাজোচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

রাজন্!

কোথায় আমি দীনহীন গ্রন্থকার, আর কোথায় আপনি অতুল ধনের অধীশ্বর রাজপুত্র। আপার অনুগ্রহ লাভ করা, মাদৃশ জনের পক্ষে আকাশ কুসুমের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তবে নারাজোলের রাজবংশ নাকি চিরকাল ধর্ম্মপথগামী, ধর্ম্মই নাকি তাঁহাদের ভিত্তিস্বরূপ, এই সাহসেই আজ আমি আপনার নিকট উপস্থিত। দরিদ্রতাই কবিগণের উন্নতির কণ্টক, তবে ধনিগণ তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করিলে তাহাদের উন্নতির উপায় কৈ? আপনারা বংশ পরম্পরায় এ বিষয়ের আদর্শস্থানীয়। এই জন্য আমি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত মৎপ্রণীত এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি আপনার পরম পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া লেখনী ধারণ সার্থক করিলাম।

দক্ষিণ বেটরা হাওড়া।
১লা মাঘ, সন ১৩০০ সাল।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন।

সরলহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট কৃতজ্ঞতা সহকারে নিবেদন এই যে, মৎপ্রণীত সত্যবতী, আদর্শ দম্পতি, ভুবন-মোহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়া আপনাদের প্রসাদ লাভ করিয়াছে। যাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, দেখিয়া সাতিশয় উৎসাহিত হইয়াছি। অধুনা "অনাথিনী" নামক এই ক্ষুদ্র উপন্যাস খানি প্রকাশিত হইল এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে আপনাদের নিকট প্রেরিত হইল। ইহা অপরাপর পুস্তকের ন্যায় আদরণীয় হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব, তবে ইহা যে সকলের নিকট সমান ভাবে সমাদৃত হইবে সে আশা করা বৃথা। কারণ "ভিন্নরুচির্হি লোক" সকলের রুচি সমান নয়। কোন কার্য্য করিলে হয় সুযশ নয় কুযশের ভাগী হইতে হয়। আমার ভাগ্যে যে কি আছে বলিতে পারি না। ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। তাহাতে ভীরু হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে কেন? তবে আমি এরূপ বলিতে সাহস করিনা যে, এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য; কারণ মানবমাত্রে "ভ্রমের ভ্রমরা" তাই সুযশ মধু আহরণ করিতে তাহাদের এত কষ্ট হয়। আর পরিশ্রমে উপার্জ্জিত বস্তুই নাকি বড় আনন্দদায়ক—তাই আজ আমি এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, জানি না পরিণামে অদৃষ্টে কি

আছে। যে পুস্তকখানি লিখিতে বসিয়াছি, ইহা পূর্ব্বের একটা সামান্ত ধুয়া ধরিয়া রচিত হইয়াছে। স্বাধীনতা যে কি সুখ, তাহা এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইল। পরাধীন হইতে যে কেহই ইচ্ছা করেন না—এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত যে স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহা "অনাথিনী"র চরিত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
দক্ষিণ বেটরা—হাওড়া।

আমি,

অনাথিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাবুক পথিক।

গ্রীষ্মকাল, চৈত্রের শেষ,—দিবাকর-করজালে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গ্রামাপথ সকল লোক জন বিরহে খাঁ খাঁ করিতেছে। বালুকাকণা অগ্নিশর্মার ন্যায় হইয়া, বায়ুভরে দিগদিগন্তে ছুটিতেছে। পিপাসিত পথিকগণ পিপাসায় অস্থির হইয়া, জলাশয়, গৃহস্থের বাটী ও বৃক্ষচ্ছায়া অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ করিতেছে। একে প্রচণ্ড রৌদ্র, তাহাতে আবার দুরন্ত বসন্ত বায়ু ধূলিকণার সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কাহার সাধ্য যে, এ সময় বাটী হইতে বাহির হয়। তবে যাহার না বাহির হইলে নয়, যিনি নিরাশ্রয়, তাহাকে অবশ্যই বাহির হইতে হইবে। পাঠক! ঐ দেখুন, এই ভয়ানক রৌদ্রে লাহোরের গ্রীষ্মবহ্নী প্রদেশ দিয়া একটী যুবক যাইতেছেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, পিপা-

সায় ওষ্ঠাগত প্রাণ—পথিক আর চলিতে পারেন না, ধীরে ধীরে একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। যুবকের বীর-বেশ, বর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছে; কটিতটে শাণিত তরবারি দোদুল্যমান, এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত পথের সম্বল, বিপদের সহায়, আর কিছুই ছিল না। যুবা পথিক বৃক্ষতলায় বসিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন; শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"হায়! অসময়ে পিতৃমাতৃহীন, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এত কষ্টভোগ করিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর; মান গেল, কীর্ত্তি গেল, শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি সকলই যবনের পদানত হ'ল, এতদিনে ক্ষত্রিয় নাম ভারত হইতে লোপ হ'ল। হায় হায়! এ অসময়ে আমার এমন কেহই নাই যে, আমাকে দুই একটা উৎসাহবাক্য প্রদান করে। হায়! বিক্রমকেশরী! তোমার মনে এই ছিল, আমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, আমারই সর্ব্বনাশ আশা। পাষণ্ড! এই কি ক্ষত্রিয় বীরের কর্ম্ম, এই কি কৃতজ্ঞতার পরিচয়!"

পথিক শেষের এই কয়েকটী গ্লানিসূচক বাক্য বলিতে বলিতে হঠাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় বলিলেন,—"ছি ছি! আমি কি করিতেছি, কাহাকে নিন্দা করিতেছি, বিক্রমকেশরী যে আমার প্রাণসমা লাবণ্যময়ীর পূজ্যপাদ পিতা,—আমার ভাবী-শ্বশুর।" এই বলিয়া, যুবক আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইতে লাগিল। প্রকৃতি ভীষণমূর্ত্তি পরিহার করিয়া, নবসাজে সজ্জিতা হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে মলয়-পবন প্রবাহিত হইয়া, ধরাকে সুশীতল করিতে লাগিল। রৌদ্রের উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি তিরোহিত হইয়াছে দেখিয়া, তরুর কোটরস্থিত

পক্ষিগণ ধীরে ধীরে শাখায় বসিয়া, আপন আপন রাগ রাগিণী আলাপ করিতে লাগিল। কোকিলও পাখীর জাতি,—সে আর থাকিতে পারিল না; একলাই আপনার পঞ্চম-তানে কুহু কুহু করিয়া উঠিল। পাঠক! আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ভাবুক থাকেন, তাহা হইলে এই সময়ের ঘটনা একবার মনে মনে অনুভব করুন। চিন্তাযুক্ত মনকে নিশ্চিন্ত করিতে, হতাশ-হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে, এমন মহৌষধ আর নাই। যুবক ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, সহসা বসন্তসেনার কুহুরব শুনিয়া চমকিত হইলেন; দেহ কণ্টকিত হইল, কুসুমায়ুধের সম্মোহন শরে দেহ জর জর হইতে লাগিল, ভাবুক যুবার মন প্রাণ ভাব-স্রোতে ভাসিতে লাগিল, সকল কষ্টের যেন কথঞ্চিৎ লাঘব হইল, মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল, হৃদয় যেন নববলে বলীয়ান হইল. ভাবুক যুবা মনের আবেগে নিম্নলিখিত কবিতাটী মনে মনে রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন;—

১

সহসা মনেরি কেন ভাব বিপর্য্যয়,—
হইল রে পোড়া পাখি বল ত্বরা করি।
কোথায় পাইলি হেন স্বর মধুময়;
যাহাতে ঢালিলি প্রাণে শান্তি-সুধা-বারি॥

২

নব ভাবে চিত মম হ'ল পুলকিত,
হতাশ-হৃদয়ে হ'ল আশার সঞ্চার;
মরমের জ্বালা সব হ'ল নির্ব্বাপিত,
তোমায় নিরখি হৃদি যুড়াব আমার।

৩

যদিও তোমার নাহি রূপ বিমোহন,
কুরূপের একশেষ দেখিতে তোমায় ;
তথাপি তোমার রবে মানবের মন—
পুলকিত হয় সদা শ্রবণ যুড়ায়।

৪

আমিও তোমার মত শুনরে কোকিল,
নাহিক রূপের জ্যোতিঃ কুরূপের শেষ ;
তাই তোরে দেখে মম মানস মোহিল,
মনোমধ্যে নব আশা উদিল অশেষ।

৫

অসুখী-মানব-চিত সুখী করিবারে,
তব সম কেহ নাহি পারে অবনীতে ;
তব স্বরে প্রেমিকের প্রেম-বারি ঝরে,
ভাবুকের মন-প্রাণ ভাসে ভাব-স্রোতে।

৬

চিরদুঃখী মানবের কর উপকার,
পর-উপকার ব্রত জান বিধিমতে ;
মনেরে সান্ত্বনা-মধু দানিবারে আর,
তব সম কেবা বল পারে অবনীতে।

৭

শিখাও অজ্ঞান আমি পর-উপকার,
ডাক দেখি কুহুস্বরে যুড়াক পরাণ ;

আমিও তোমার সনে মাতিয়ে আবার,
প্রেমানন্দে মেতে করি বিভুগুণ গান।

৮

প্রকৃতির নব শোভা বসন্ত সময়ে,
তোমার মোহন স্বর কত যে মধুর ;
কি বলিব আর, সুরসিকের হৃদয়ে,
তুমিই কোকিল ঢাল সুধার সু-ধার।

৯

করযোড়ে বলি তাই প্রাণের বিহঙ্গ,
এই রূপে সুশীতল কর়হে জীবন ;
বড় ভালবাসি আমি তোমার প্রসঙ্গ ;
তুমিই প্রাণের মম শান্তিময় ধন।

১০

আপামর সাধারণ ভুবন ভিতর,
রূপ মদে মত্ত যত নরনারী-কুল,
শিখুক তাহারা গুণ তোমার গোচর,
তুচ্ছ ভাবি রূপ মদ অনিত্য সম্বল।

১১

হে মানব ! কতকাল রূপের গৌরবে,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যাপিবে জীবন ?
কোকিলের সুদৃষ্টান্ত হৃদয়েতে ভেবে,
মুছিতে মনের কালি করহে যতন।

১২

রূপে কি করিবে যদি গুণ নাহি রয়,
নির্গুণ শিমুল ফুলে কে করে আদর ?
তেমতি মানব যদি গুণ হীন হয়,
অসার রূপের জ্যোতিঃ শোভা নাহি পায়।

উদ্ভ্রান্ত পথিক কবিতাটী সমাপ্ত করিয়া বলিলেন,—"বসন্ত-সখা ! তুমি ধন্য ! তুমি একাকী এই অসংখ্য মানবের যে কত উপকার কর, তাহার ইয়ত্তা নাই।"

মানব মন রহস্যের ভাণ্ডার, কখন কি ধূয়া ধরিয়া যে উত্তেজিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে ? যুবক কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবাবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"মন ! স্থির হও, এ সময় এত উন্মত্ত হইলে চলিবে কেন ? আমি এখন অপার বিপদ-সমুদ্রে ভাসমান, এ সময় প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ ঢালিলে, বিপদ সমুদ্রে কূল পাইব না। লাবণ্যময়ীর প্রেম-সাগর এখন বহু আয়াসসাধ্য, লাবণ্যময়ী-লাভ এখন আমার পক্ষে আকাশকুসুমের ন্যায় তবে কেন বৃথা অধৈর্য্য হয়ে আমাকে কষ্ট দাও ? আগে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর, অসংখ্য যবন-পরিবেষ্টিত স্বদেশের উদ্ধার সাধন কর, পর-হিত-ব্রতে দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ কর, যদি সফল-কাম হইতে পার, তা'হলে লাবণ্য-প্রণয় পুরস্কার পাইবে, আর যদি না পার, তবে বিষের বাতি জ্বালিও না। এ সময় সে হলাহল পান করিলে আমার জীবন যায় ; সে ত শ্লাঘার বিষয়। সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, অক্ষয় স্বর্গভোগ হইবে। এই বলিয়া যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বীরত্বসহকারে বলিলেন,—মহম্মদ গজনবি !

এত সাহস কেন? পাষণ্ড! তুই কি জানিস্ না, পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার জন্ত। তুই কি মনে করিয়াছিস্, ক্ষত্রিয়বীরগণ কাপুরুষের ন্যায় সাহস, ক্ষমতা, প্রাণের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া তোর পদানত হইবে? এ আশা তুই কথনই মনোমধ্যে স্থান দিস্ না। যত দিন ক্ষত্রিয়ের দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিবে, ততদিন তাহারা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিবে না। বিক্রমকেশরী তোর সহায় হইয়া, আজ্ঞাবর্ত্তি দাসের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি রাজা জয়পালের বীর-পুত্র অনঙ্গপাল, এ জীবন থাকিতে, কথনই যবনের দাসত্ব স্বীকার করিবে না। যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"যাই, দেবী মাতঙ্গিনীর মন্দিরে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া কিয়ৎ-ক্ষণ বিশ্রাম করিগে, তার পর রজনীযোগে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।" এই বলিয়া তুই একপদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় একটী যুবতী ধীরে ধীরে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিল,— "কুমার! আপনার পলায়ন সংবাদ শ্রবণে আমাদের সখি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে আমি আপনাকে নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াছি, এখনও তিনি কেলি-কাননে আপনার অপেক্ষায় আছেন, এখন আপনার কি অভিরুচি হয়?" যুবক চমকিত হইয়া বলিলেন,—"যমুনে! তোমার সখির ঋণ আমি এ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না, অনঙ্গপাল এ জীবনে কথনই তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয় বিস্মৃত হইবে না। বিধাতা যদি কথনও দিন দেন, তাহা হইলে, আবার তাঁহার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া এ জর্জ্জরিত দেহ শীতল করিব। আমি এখন মাতঙ্গিনীর দেবীর মন্দিরে যাইতেছি। সন্ধ্যা-

বন্দনাদির সময় উত্তীর্ণ হইতেছে, আর বিলম্ব করিতে পারি না। অদ্য দেবী মন্দিরে বিশ্রাম করিয়া, কল্য গভীর রজনী-যোগে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সখিকে বলিও, অনঙ্গপাল তাহারই প্রেমদাস; এখন বিদায়।" এই বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন। যমুনাও কুমারের অনুসন্ধান করিয়া, রাজবাটী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•—

যবন অধিকার।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খৃষ্টির ৫৬৯ অব্দে আরব দেশের অন্তর্গত মক্কানগরে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপনাকে ত্রিকালজ্ঞ ও অবতার প্রতিপন্ন করিবার মানসে তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মসকল ভ্রমসঙ্কুল এবং আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বলপ্রয়োগ করিয়া কাফেরদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, বলপ্রয়োগ করিয়া, তাহাদিগকে মুসলমানধর্ম্মে আনিতে পারিলে তাহাদের গৌরববৃদ্ধি ও পরকালে স্বর্গসুখ লাভ হইবে, এইজন্য যবনগণ কোরাণের মত অবলম্বন করিয়া চারিদিকে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই নানাদেশ জয় করিয়া আপনাদের মনোরথ সিদ্ধ করিতে লাগিল। এই সূত্রে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ক্রমান্বয়ে একশত বৎসর মহম্মদ নানাস্থানে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পরে মহম্মদের উত্তরাধিকারী খলিফারা কয়েকবার সামান্যরূপে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ কাসীম পুনরায় সৈন সহ চিতোর আক্রমণ করেন, কিন্তু তথায় চিতোররাজ

বাপ্পারাও কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। অনন্তর কাসীম পরাজিত হইলে, অনেক দিন পর্য্যন্ত যবনগণ আর এ দেশে আসেন নাই। বিজিত সিন্ধুদেশে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সকল কিছুদিন মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, তৎপরে হিন্দুরা তাহা অধিকার করিয়া লয়েন। কিন্তু দৈব যাহার প্রতিকূল, তাহার উদ্ধারের আশা কোথায়?

তৎপরে জনৈক মুসলমান রাজা সিন্ধুনদের পশ্চিম উপকূলে গজনীনগরে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় সুলতান মহম্মদ নামক একজন মুসলমান অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া মহম্মদ গজনবি নাম ধারণ করিয়া অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তন্মধ্যে দ্বাদশবারই অতি প্রসিদ্ধ। পরশত্রু অপেক্ষা ঘরশত্রু ভয়ানক। সর্ব্বাগ্রে এ শত্রু নাশ করা বিধেয়। নতুবা সকলই বৃথা হইবে। রক্ষকুল নির্ম্মূল হইবার কারণই এই গৃহশত্রু। গৃহ-শত্রু বিভীষণ সন্ধান না বলিয়া দিলে, কাহার সাধ্য যে অগণ্য রক্ষকুল নির্ম্মূল করে? যাঁর এক লক্ষ পুত্র ও সওয়ালক্ষ নাতি এবং তেত্রিশ কোটী দেবতা যাঁর দাসানুদাস, সে বংশের ধ্বংস কোথায়, কেবল বিভীষণ কর্ত্তৃক সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল, নতুবা কাহার সাধ্য সে বিপুল বংশের উচ্ছেদ সাধন করে। চতুর চূড়ামণি মুসলমানগণ প্রথমতঃ জয়পালের সেনাপতি বিক্রমকেশরীকে নানা প্রলোভনে হস্তগত করিয়া, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন বিক্রমকেশরী রাজ্য প্রাপ্তির আশায় তাহাদের সহিত যোগ দিলেন। যবনগণ বিনা আয়াসে লাহোর নগরে প্রবেশ করিল। জয়পাল পূর্ব্বে ইহার কিছুই জানিতেন না। সহসা মুসলমানদিগকে রাজ্যমধ্যে

প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, প্রাণপণে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু অসংখ্য শত্রুর মধ্যে একাকী জয়পাল কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্ম জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। জয়পালের এতাদৃশ অপমৃত্যু দেখিয়া, তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার অনঙ্গপাল কাতর হৃদয়ে পলায়ন করিলেন। যবনগণ সমরে জয়ী হইয়া, পরিশেষে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করতঃ প্রস্থান করিল। "ঘরের ঢেঁকি কুমীর" বিক্রমকেশরী জয়পালের মৃত্যু ও তদীয় পুত্র অনঙ্গপালের পলায়নে আনন্দে অধীর হইলেন। ভাবী রাজ্যপ্রাপ্তি আশায় উল্লাসিত-চিত্তে উৎসব আমোদে মত্ত হইলেন। কিন্তু হায়! অদৃষ্ট চক্রের পরিবর্ত্তনে রাজকুমার অনঙ্গপালের দুর্গতির একশেষ। তিনি নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়! পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে পথিকের বিষয় অবগত হইয়াছেন, তিনিই আমাদের মৃত জয়পালের রাজ্য-ভ্রষ্ট পলাতক পুত্র অনঙ্গপাল। আহা! যিনি পদ হইতে পদান্তরে যাইতে হইলে, নানাবিধ যানারোহণে গমন করিতেন। সুধাধবলিত গৃহে স্বর্ণপর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া যাঁহার নিদ্রা হইত না, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধাল্লে যাঁহার তৃপ্তি হইত না। কেমন করিয়া তিনি আজ কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন ও বনের কটুকষায় ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন? কিন্তু পরিশ্রম না করিলে ফল লাভ হয় না। দুঃখ ভোগ না করিলে সুখ কোথায়? ছোট না হইয়া কে কবে একেবারেই রাজ সিংহাসন লাভ করিতে পারিয়াছে? সেনাপতি বিক্রমকেশরী মনে করিলেন—"এইবার আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, এইবার আমি বিনা আয়াস লাহোরের সিংহাসন

লাভ করিলাম।” কিন্তু মানব যাহা গড়ে, ভগবান তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। মানবের সকল আশাই যদি সফল হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? বিক্রমকেশরী মুসলমানদিগের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া, রাজ্যলাভ আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। স্বার্থই মানব জীবনের মূলমন্ত্র। তাই বিক্রম-কেশরী পাপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিলেন। বিক্রমকেশরী আহ্লাদে অধীর হইয়া বলিলেন,—“যেন তেন প্রকারেণ স্বোদরং পরিপূরয়েৎ” যেরূপ প্রকারে হউক, আপনার উন্নতি হইলেই হইল। অগ্রে রাজ্যলাভ, পরে লাবণ্যময়ীর বিবাহ; কিন্তু লাবণ্য যে অনঙ্গপাল ভিন্ন,—তাহাতে কি, সে এতাদৃশ কৌশল করিয়া রাজ্যলাভ করিতে পারে, সে কি একটা সামান্য স্ত্রীলোকের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না? হাঃ হাঃ হাঃ! আমার অসাধ্য কি আছে! এই বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেলি-কানন।

মধুমাস সমাগত; লাহোরের দুর্দ্দশার পূর্ব্বশোক বিস্মৃত হইয়া এতদিন পরে ঋতুরাজ বসন্ত আবার দেখা দিয়াছেন। লতা গুল্ম শ্রেণীর প্রফুল্ল প্রসূন-সৌরভে আমোদিত হইয়া মলয়ানিল ধীরে ধীরে সকলের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিতেছে। মুকুলিত তরু-কুল নূতন শোভায় সুশোভিত হইয়া যেন নতভাবে রাজপদে প্রণিপাত করিতেছে।

বেলা অপরাহ্নের সমীপবর্ত্তী। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র পড়িয়া গিয়া প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবমনে এক অভূতপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি প্রদান করিতেছে। এ সময় রোগী, শোকী, সকলেই আনন্দিত। বসন্তকালের আনন্দ আনয়ন করিতে হয় না—নিজেই আসে, অলক্ষিতে আসিয়া সকলকে হাসায়, নাচায়; বিশেষতঃ যুবক যুবতীর পক্ষে এমন আনন্দদায়ক ঋতু আর নাই। লাহোরের অদূরবর্ত্তী রম্য কেলি-কাননে দুটি যুবতী সন্ধ্যাকালীন স্নিগ্ধ মলয়ানিল সেবনে বাহির হইয়াছেন। কানন মধ্যে নানা বিধ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে যুবতীদ্বয় কাননের চারিধার পরিভ্রমণ করিয়া একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। উহার মধ্যে একটীর বেশভূষা অপরটী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, ইনি সেনাপতি বিক্রমকেশরীর প্রিয়-তমা দুহিতা—নাম লাবণ্যময়ী, অপরটী তাঁহার সখী—নাম যমুনা

পাঠকের বোধ হয়, স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ ইহাদের নামোল্লেখ হইয়াছে।

লাবণ্যের বয়স এখন প্রায় ত্রয়োদশবর্ষ হইবে, যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে চারা উৎপন্ন হইয়া বৃহৎ তরুরূপে ঊর্দ্ধমুখে অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে, লাবণ্যময়ীও তদ্রূপ যৌবন-তেজে বিকাশোন্মুখ হইতে লাগিলেন।

দুইজনে বৃক্ষমূলে বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। লাবণ্যময়ী সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—"প্রিয় সখি! তুমি যে সমস্ত দিবস কুমারের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলে, তাঁহার সন্ধান পাইয়াছ কি?"

যমুনা বলিল,"হাঁ। সখি! সমস্ত দিন নানাস্থলে অন্বেষণ করিয়া বহু কষ্টের পর সন্ধ্যাকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।" লাবণ্যময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"যমুনে! বল, তিনি এখন কোথায়, কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন?" যমুনা উত্তর করিল—"তিনি এখন মাতঙ্গিনীর মন্দিরে লুক্কায়িত আছেন। কল্য প্রভাতে তথা হইতে ত্রিশপল্লি রওনা হইবেন। তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যবন বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন।"

লাবণ্যময়ী এইবার মনে মনে বলিলেন—"ধন্য বীর! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ, ধন্য তোমার পরহিত ব্রত, তুমিই যথার্থ বীর নামের যোগ্য এবং এই অভাগিনী লাবণ্যময়ীর উপযুক্ত পাত্র। তোমার ন্যায় নিঃস্বার্থপর, পরহিতকাঙ্ক্ষী, বীরেন্দ্রের পদ সেবা করিতে পারিলে আমার নারীজন্ম সফল হইবে।" শেষে যমুনাকে বলিলেন—"সখি! তিনি আবার কত দিনে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন, সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি কি?"

যমুনা বলিল—"সখি! সমস্তই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন বিষয়ের সদুত্তর পাইলাম না, শেষে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম। কিন্তু তিনি সে বিষয়েও নারাজ— কোনও কথা কহিলেন না, কেবল বলিলেন, তোমার সখির ঋণ আমি এজন্মে পরিশোধ করিতে পারিলাম না। অনঙ্গপাল জীবন থাকিতে কখনই তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তোমার সখিকে বলিও, অনঙ্গপাল তাহারই প্রেম-দাস।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যুবতী সহচরী প্রমুখাৎ অনঙ্গপালের ভালবাসার কথা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, প্রাণপ্রিয়বরের মঙ্গলের জন্য ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বলিলেন,—"দেব কিরণমালিন্! হতভাগিনী আমারই বংশসম্ভবা কুমারী, আপনি দয়া না করিলে এই অভাগিনীর আর আশ্রয় স্থান কোথায় প্রভু? অভাগিনীর হৃদয়সর্ব্বস্ব রাজকুমার হইয়া আজ ভাগ্যদোষে নিরাশ্রয় বনচারী। দেখ ঠাকুর! যেন তাঁহাকে তোমার সুক্ষ্ম দৃষ্টির বহির্ভূত করো না। তিনি যেন সফল মনোরথ হইয়া পুনরায় দেশে আসিয়া, আমার পাণিগ্রহণ করেন।"

পাঠক! দেখুন, পবিত্র প্রণয়ের ছবি কি চমৎকার, এ ছবি যার আছে, এ নিধি যিনি একবার অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার আর অভাব কি? এ নশ্বর জগতে তিনিই সুখী। তাই বলি, প্রণয়ের তুল্য অমূল্য পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই, এ অপূর্ব্ব নিধি বাজারে বিক্রয় হয় না, ধনে এ ধন পাওয়া যায় না, রাজার ভাণ্ডারে এ জিনিস নাই। ইহা কেবল মনে আর নয়নকোণে। মনের সহিত যাহাকে একবার দর্শন করা যায়, এবং মন ও নয়নে

যদি উভয়ের ঐক্য হয়, তাহা হইলেই উভয়ে উভয়ের প্রণয় ডোরে আবদ্ধ হয়, নতুবা যতই ধন দাও, ইহা মিলিবার নয়। শুধু দাম্পত্য-প্রণয় কেন? সকল প্রকার ভালবাসার রীতিই এরূপ, মনের মিল না থাকিলে ভালবাসা জন্মায় না। প্রণয়ে ধনী দরিদ্র নাই, মন যাহাকে চায়, সে দীনহীন হইলেও, প্রণয়ীর পক্ষে লক্ষপতি। যাহার প্রতি ভালবাসা হয়, তাহার অদর্শনে কত কষ্ট হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। লাবণ্যময়ী এখন অনূঢ়া, কুমারের সহিত এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই, তথাপি তাঁহার যেরূপ ভালবাসা হইয়াছে, না জানি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলে আরও কত হইবে। পূর্ব্বে রাজা জয়পাল জীবিত থাকিতে থাকিতে বিক্রমকেশরীর ইচ্ছা ছিল, লাবণ্যময়ীর সহিত অনঙ্গপালের বিবাহ দেন এবং তিনি দুই তিনবার রাজার নিকট ইহার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রাজারও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না—অকালেই সমস্ত আশা-ভরসা ছিন্ন হইল। পূর্ব্বে বিক্রমকেশরী অনঙ্গপালকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, ভাবী জামাতা জ্ঞানে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন। অনঙ্গপাল প্রায় সদা সর্ব্বদাই সেনাপতির ভবনে যাইতেন। এই সময়েই লাবণ্যময়ীর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছিল। এবং সকলেই জানিত, অনঙ্গপালের সহিত লাবণ্যময়ীর বিবাহ হইবে। কিন্তু বিক্রমকেশরীর পাপ আকাঙ্ক্ষা লাবণ্যময়ীর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে লাবণ্যময়ী অনঙ্গপাল ভিন্ন জানে না, যে লাবণ্যময়ী বাল্যকাল হইতে অনঙ্গপালের প্রেমে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছে, যে অনঙ্গপাল তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব, আজ তিনি কেমন করিয়া সেই অকৃত্রিম ভালবাসা বিস্মৃত হইবেন

পিতার মতে কেমন করিয়া অন্যে আত্ম সমর্পণ করিবেন। আনু পূর্ব্বিক এই সকল চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইল,—নয়নকোণে অশ্রু দেখা দিল,—লাবণ্যময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। "কাহার সর্ব্বনাশ কাহার পৌষ মাস।" যমুনা লাবণ্যকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন,—"সখি। সামান্য প্রণয়ে অধীর হইয়া কি তোমার ন্যায় বীর রমণীর ক্রন্দন করা উচিত। কেন তুমি অনঙ্গপালের জন্য ক্রন্দন করছ। তোমার পিতা তোমাকে অনঙ্গপালের করে অর্পণ করিবেন না। আর অনঙ্গপালের কি আছে,—সে রাজ্যভ্রষ্ট, পথের কাঙ্গাল, তোমার ন্যায় ধনবান পুত্রীর সহিত কি অনঙ্গপালের ন্যায় হত-ভাগ্যের বিবাহ হওয়া অসম্ভব, রাজহংস স্বচ্ছ সরোবরেই কেলি-করে, সে কি পঙ্কিল হ্রদে অবগাহন করিতে ইচ্ছা করে। সখি! আমার কথা শুন,—সেনাপতির অনুমতি ক্রমে অন্যপাত্রে প্রণয় স্থাপন কর, তাহা হইলে শীঘ্রই সুখিনী হইবে।"

লাবণ্য নিজ সহচরীর মুখে এই মর্ম্মঘাতী, প্রাণঘাতী কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে নিজ অঞ্চল দ্বারা নয়নজল মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন,—"যমুনে! মন কি কুসুম? যে আজ ফুটিল, কাল তাহা শুখাইয়া গেল। মন কি তা জান, সখি! কঠিন লৌহাপেক্ষা দৃঢ় বস্তু যদি জগতে কিছু থাকে, মন তাহাতেই নির্ম্মিত। উহাতে যাহা একবার অঙ্কিত হইবে, তাহা আর কখন বিলীন হইবে না; তুই দেখিস যমুনা,—পিতা আমার প্রাণবধই করুন, আর রাজ প্রাসাদ হইতে দূরীভূতই করুন, চিরকাল কুমারী থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি কখনই অনঙ্গপাল ভিন্ন অন্য কাহাকেও

বিবাহ করিব না। যদি কখন বিধাতা দিন দেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমার বাসনা সফল হইবে।

যমুনা বিক্রমকেশরীর অনুমতি অনুসারে লাবণ্যময়ীকে কত বুঝাইল, কত প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! বীর রমণী বীরের ন্যায় অটল অচল, সে প্রতিজ্ঞা কিছুতেই নড়িবার নয়। পাঠক! দেখুন, সময় মন্দ হইলে সকলেই প্রতিকুলাচরণ করে। অনঙ্গপাল যখন রাজপুত্র ছিলেন, যখন অসংখ্য দাসদাসী তাহার অনুমতিক্রমে কার্য্য করিত। যমুনাই তখন কুমারের অনুগত হইয়া, কত মনের মত কথা কহিত। কিন্তু এখন সেই যমুনাই তাহার অনিষ্ট সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। হায়রে দুর্ভাগ্য! তোর আক্রমণে মানবের দুরবস্থার একশেষ হয়। যে এক সময়ে পদ লেহনের সামগ্রী ছিল, এখন সেই বস্তু সময় পাইয়া মস্তকে উঠিতে প্রয়াসী হইতেছে। তাই বলি, কেহই নাই,—যে সকল বন্ধু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা কেবল সুসময়ের সহচর, অসময়ের কেহ নয়। তাই যমুনা আজ সকল ভুলিয়া কুমারের বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্তা। কিন্তু লাবণ্যময়ীর ত তাহা নয়, অনঙ্গপালের সহিত যে লাবণ্যের প্রাণের সহিত সম্বন্ধ, তিনি কেমন করিয়া ভুলিবেন, লাবণ্যময়ী গর্ব্বিত বচনে পুনরায় বলিলেন,—"যমুনা! তুই পিতার সহিত যতই ষড়যন্ত্র কর, লাবণ্যময়ী প্রাণ থাকিতে কখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। যমুনা তুই আরও জানিস্, লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয় কন্যা, তাহার হৃদয়ে ভয়ের লেশমাত্র নাই। এখনও বলি, লাবণ্য অনঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও মুখ দর্শন করিবে না। আরও বলি শোন, এ জীবন বিধি শুধু অনঙ্গের জন্যই সৃজন করিয়াছিলেন,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ জীবনে অনঙ্গই আমার প্রাণেশ্বর, অনঙ্গই আমার জীবনসর্ব্বস্ব, অনঙ্গই আমার প্রভু, জীবন থাকিতে অনঙ্গ ভিন্ন আর কাহাকেও এ হৃদয় অর্পণ করিব না, তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করিব না, লাবণ্যময়ী প্রাণ থাকিতে দ্বিচারিণী হইতে পারিবে না। তুমি পিতাকে বলিও, লাবণ্যময়ী তোমার প্রস্তাবে সম্মত নয় "এই বলিয়া বীর পত্নীর ন্যায় ধীর পদবিক্ষেপে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যমুনার সকল মন্ত্রণা বিফল হইল। যমুনার সাধ্য কি যে, বীর্য্যবতী লাবণ্যময়ীর সহিত কথা কয়। লাবণ্যের উগ্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া বাস্তবিকই যমুনার ভয় হইয়াছিল, লাবণ্যময়ী চলিয়া গেলে, যমুনা বলিল,—উঃ! ছুড়ির কি তেজ, কি গর্ব্ব, বাপ মায়ের কথা শুনেনো গা, এমন মেয়েও ত দেখিনি। সেনাপতি বলিয়াছিলেন, লাবণ্যময়ীর মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, আশাতীত পুরস্কার দিবেন, কিন্তু কই তা ত হোল না, লাবণ্য ত কথা শুন্‌লে না। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" আমি এত করে বুঝাইলাম, সকলই বৃথা। ছুড়ি যদি আমার মতে মত দিত, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই কত শত নূতন ভ্রমর এসে গুন গুন স্বরে কত খোষামোদ কর্‌তো, তা আমি কি করিব, সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়, যার অদৃষ্টে সুখ নাই তাহাকে সুখী করা কার সাধ্য। লাবণ্যময়ী অনঙ্গপালকে যে কি সোনার চক্ষেই দেখেছে, তা বলিতে পারি না; যাই, আর চিন্তা করিলে কি হইবে। সেনাপতিকে লাবণ্যময়ীর কথা সকল জ্ঞাপন করিগে। এ বিষয়ে তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন তাহাই করুন, লাবণ্যময়ীর চিত্ত পরিবর্ত্তন করা আমার সাধ্য নয়। লাবণ্যময়ীর মন হইতে অনঙ্গপালকে দূরীভূত

করা সামান্য মানবের আয়ত্তাধীন নয়। যত দিন উভয়ে জীবিত থাকিবে, তত দিন এ প্রণয় রজ্জু ছিন্ন হইবে না। এ রজ্জু উভয়ের প্রাণে প্রাণে বাঁধা, জোর করিয়া বন্ধন শিথিল করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ,—প্রাণ সংশয় হইবে। ধন লোভে কেন এক জনকে প্রাণে বিনাশ করিব, আমার এমন সর্ব্বনেশে অর্থে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া যমুনা মনের দুঃখে সেনাপতির নিকট চলিয়া গেল।

— —

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে।

যামিনী দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়,—চারিদিক নিস্তব্ধ মাঝে মাঝে ঝিল্লি দল ঝিঁ ঝিঁ রবে যামিনী সতীর কর্ণ শীতল করিতেছে। রজনীঘোষী শৃগালকুল ঘোর কোলাহল করিয়া গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। পেচক সকল দিবাচর পক্ষীগণকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেছে। এহেন সময়ে কেহই জাগ্রত নাই, কেবল জনৈক যুবা সন্ন্যাসীর বেশে ভাগিরথীর তটসন্নিহিত শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া করকপোলে হাত দিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। সর্ব্ব শরীর ভস্মে আচ্ছাদিত, সুন্দর জটাজাল পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত, পরিধান গেরুয়া বসন গলে রুদ্রাক্ষ মালা শোভা পাইতেছে, যুবকের বেশ ভূষা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে, স্বতঃই মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। কিন্তু এ কি; যিনি সন্ন্যাসী গৃহসুখ বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম পথের পথিক হইয়াছেন, তাহার এত চিন্তা কিসের? হায় হায়! যুবক, কেন তুমি ধর্ম্ম পথগামী হইয়া অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছ? কেন তুমি চিন্তানলে জর্জ্জরিত হইয়া নিজের দেহ মাটি করিতেছ? ছাড় চিন্তা ছাড়,—না, চিন্তা হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কাহার সাধ্য নয়। চিন্তা যে মনের সহচরী, মন কি চিন্তা ছাড়া থাকিতে পারে? তুমি সন্ন্যাসীই হও, আর ঘোর

সংসারীই হও; চিন্তা ইহকালের জীবন সম্বল; চিন্তাই জীবের জীবন; চিন্তা না করিয়া কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যুবক একবার আপনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"হাঁ, ঠিক হইয়াছে, এ বেশে আমাকে আর কেহই চিনিতে পারিবে না। এখন আমি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিব।" এই বলিয়া পশ্চাতে ফিরিলেন—সম্মুখে একটী মন্দির, যুবক শিলাখণ্ড হইতে অবতরণ করিলেন, ভূমিতলে জানু পাতিয়া করযোড়ে মন্দিরস্থিত দেবী-প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"দেবি মাতঙ্গিনি! আজ তোমার প্রিয় সন্তান তোমার পরম পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। দেখো মা! সন্তানের মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়, পুনরায় যেন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তোমায় এবং প্রাণ প্রিয় জন্মভূমিকে অস্পর্শীয় যবনগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিব মা। আমি ক্ষত্রিয় সন্তান, তোমার শ্রীপদ প্রসাদে চিরকালই বীর্য্যবান, আজ কেমন করিয়া নিতান্ত হীন-বীর্য্যের ন্যায় অকাতরে শত্রু করে স্বাধীনতা রত্ন অর্পণ করি? মা! প্রাণ থাকিতে বীর জয়পালের প্রিয়পুত্র অনঙ্গপাল কখনই এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে না। যদিও মা! এই বিপদের সময় সকলেই আমার বিপক্ষ; কিন্তু দেবি! তোমার শ্রীচরণ বলে আমি সকলকেই তৃণ তুল্য জ্ঞান করি, তুমি দাসের সহায় থাকিলে, কার সাধ্য আমার অনিষ্টাচরণ করে? এই বলিয়া যুবক দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া নীরব হইলেন। পাঠক! এই সন্ন্যাসীকে কি চিনিতে পারিয়াছেন, ইনি আমাদের জন্ম-সর্ব্বস্ব কুমার অনঙ্গপাল, বীরকেশরী রাজা জয়চাঁদের একমাত্র

পুত্র। কোথায় রাজপুত্র আর কোথায় পথের ভিখারী। অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! যোগীবরের স্তব পাঠে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, আশে পাশে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়, এই বিবেচনা করিয়া, যেমন উঠিবার উপক্রম করিবেন, অমনি এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কামিনী সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। যুবক অবাক্, নিস্পন্দ, যুবতীও নতাননে দণ্ডায়মানা। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে যুবক প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"লাবণ্যময়ী! তুমি রমণী, তায় যুবতী, এই গভীর রজনীতে কেমন করিয়া একাকিনী আসিলে, তোমার হৃদয়ে কি ভয়ের লেশমাত্র নাই?" পাঠক! এই যুবতী কে, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। ইনি অনঙ্গপালের ভাবী পত্নী—লাবণ্যময়ী। পরিচারিকা যমুনার মুখে কুমার সংক্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এই গভীর নিশাকালে প্রিয় বস্তুর অন্বেষণে আসিয়াছেন। রমণী মন কি চমৎকার জিনিস, এমন সরল মন জগতে আর কাহারও নাই। এমন সরলান্তঃকরণা রমণী রত্ন যাহার গৃহলক্ষ্মী, এ জগতে তাহার কিসের অভাব। এ নিধি যার আছে, তাহার ঘোর অভাব থাকিলেও মহাসুখী, কেবল তাহারই মন প্রকৃত সুখ আস্বাদন করিয়াছে। লাবণ্যময়ী যুবকের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তম! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ যাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার আবার ভয় কোথায়? আমি বাল্যকাল হইতে ভয় কাহাকে বলে জানি না।"

অনঙ্গপাল বলিলেন,—"লাবণ্য! আমার স্মৃতি তুমি হৃদয় হইতে অন্তর্হিত করিতে চেষ্টা কর। তোমার পিতা আমার

সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত নন, কেবল তুমিই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ আমার ন্যায় হতভাগ্য কি তোমার ন্যায় আদর্শ রমণীর পতি হইবার যোগ্য? দেখ আমি রাজ্যভ্রষ্ট, আমার ধন, ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই। তোমার তুল্য সৌন্দর্য্যবতী কামিনী কখন আমার ন্যায় দরিদ্রের উপভোগ্যা হইতে পারে না লাবণ্যময়ী! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া, তোমার পিতার মতানুসারে কার্য্য করিলেই, শীঘ্রই উপযুক্ত পতিলাভ করিবে।” এই বলিয়া যুবক নীরব হইলেন। লাবণ্যময়ী যুবকের এই মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলেন এবং ছল ছল নেত্রে বলিলেন, “নিষ্ঠুর! প্রণয় কি রাজ্য ঐশ্বর্য্যের দিকে ধাবিত হয়? ধন মদে গর্ব্বিত রাজা কি স্বর্গীয় প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে, এ ধন বিনিময়ে পাওয়া যায় না, ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য। আর তুমি বলিতেছ, আমি রাজ্যভ্রষ্ট যদিও তুমি দুরাত্মাগণের ষড়যন্ত্রে এই সামান্য পার্থিব রাজ্য হইতে অপসৃত হইয়াছ; কিন্তু আমার হৃদয় রাজত্ব এখন যবনগণের অধিকৃত হয় নাই, তুমি রাজা,—আমার হৃদয় রাজ্যে অধীশ্বর হইয়া দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণকে শাসন কর।” এই বলিয়া যুবতী নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। অনঙ্গপাল লাবণ্যময়ীর এতাদৃশ অনুরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং প্রেমালিঙ্গন সহকারে যুবতীর গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—“লাবণ্যময়ি! ক্ষমা কর, অনঙ্গ পাগল হইয়াছে, অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবেচনাশক্তিরও হ্রাস হইয়াছে। এই বলিয়া নিজ উত্তরীয় দ্বারা লাবণ্যের চক্ষু জল মার্জ্জনা করিয়া দিলেন কুমারের স্পর্শে লাবণ্য সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। গভীর রজনী

যোগে অনন্ত নীলাকাশতলে যুবকের ভুজপাশে আবদ্ধ হইয়া স্বর্গসুখানুভব করিতে লাগিলেন। প্রণয়ের এই পরম সুখ। লাবণ্য কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"প্রিয়তম! দাসী আর কতদিন এইরূপ অদর্শন যাতনা ভোগ করিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই পরম দেবতা। নারী জন্মে যাহার স্বামী-পদ-সেবা ভাগ্যে না ঘটিল, তাহার আর জীবনে সুখ কি? তাহার মরণই মঙ্গল।" অনঙ্গপাল বলিলেন,—"প্রিয়তমে! ধর্ম্মের পথ অতিশয় কুটিল, দুঃখ হইতেছে বলিয়া, এত অধীর হইলে কি হইবে? ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য কর, একদিন না একদিন আমরা অবশ্যই সুখী হইব।"

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল, এখন সামান্য অন্ধকার আছে; যুবক বলিলেন,—"লাবণ্য! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। এখনি কেহ দেখিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, চল—ঐ দিক দিয়া তোমাকে রাখিয়া, আমি প্রস্থান করি।"

যুবতী এতক্ষণ সকল ভুলিয়াছিলেন,—রাত্রি প্রভাত হইতেছে দেখিয়া; তাঁহার পূর্ব্ব শোক জাগিয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবেন, না উঠিলেও নয়। সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তম! কতদিন পরে অভাগিনী আবার শ্রীচরণ দর্শন পাইবে; কতদিন পরে আবার তোমার সুশীতল অঙ্গ স্পর্শে অতুল আনন্দ উপভোগ করিব?"

অনঙ্গপাল বলিলেন,—"প্রাণাধিকে! কোনও চিন্তা নাই, অনঙ্গপাল এ জীবন তোমার কাছে বিক্রীত করিয়া শূন্যপ্রাণে চলিল। লাবণ্য! তোমার ন্যায় সরলার সরল প্রণয় ভুলিবার নয়, তবে কি করিব, এখন আমার চারিদিকে শত্রু, এখন

তোমার সহিত মিলিত থাকিলে, লোকে আমায় কাপুরুষ বলিবে, সে কথা শুনিলে তোমার সরল প্রাণে বেদনা হইবে। ক্ষত্রিয় হইয়া সে সকল পরুষবাক্য শ্রবণ করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

ক্ষত্রিয় হইয়া যে নিশ্চেষ্টভাবে পরের পদাঘাত সহ্য করে, তাহার জীবনে ধিক্। এই বলিয়া যুবা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবতীও বহুকষ্টে দাঁড়াইলেন। যুবক লাবণ্যকে শেষ আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"লাবণ্যময়ি! ভাগিরথীর তীরে দাঁড়াইয়া, মাতঙ্গিনী দেবী সমক্ষে বলিতেছি, যদি কখন ভগবান দিন দেন যদি কখন সংসারী হইতে পারি, তবে তোমাকেই অঙ্কলক্ষ্মী করিব, আর তা যদি না হয়, আজীবন তোমার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখী হইব। লাবণ্যময়ী! এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবী-মাঝে তুমি ভিন্ন আমার আর আপনার বলিতে কেহই নাই।" এই বলিয়া যুবক অধোমুখে নিরুত্তর হইলেন।

লাবণ্যময়ী যুবকের কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়োচিত সাহসবাক্যে বলিলেন,—"প্রাণাধিক! ক্ষত্রিয়ের সাহসই সহায়। ধর্ম্মই তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা। যেখানে যে অবস্থা-তেই থাক, ধর্ম্মে মতি থাকিলে কিছুতেই কষ্ট হইবে না।" এই বলিয়া বহুবিধ প্রকারে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

অনঙ্গপাল লাবণ্যময়ীর সাহসবাক্যে হৃদয়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকেও রাত্রি শেষ হইল, শুভ কার্য্যে বিলম্ব করা ভাল নয়, ভাবিয়া বলিলেন,—"লাবণ্যময়ী! আজ হইতে তুমি সেনাপতির বিষ নয়নে পড়িলে, এই হতভাগ্যের জন্য তোমাকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহার সংখ্যা

নাই।" এই বলিয়া লাবণ্যময়ীর অতুলনীয় বদনশশাঙ্ক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

লাবণ্যময়ী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—"লাবণ্য তোমার জন্ম যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারে, এমন কি তোমার সাহায্যার্থে সমর ক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিতেও প্রস্তুত আছি!" এই বলিয়া নতাননে নখাঘাতে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন।

অনঙ্গপাল উত্তর করিলেন,—"লাবণ্য! যাক, আর এ সকল কথায় আবশ্যক নাই। আমি এখন তিরিশপল্লি গ্রামে মাতুমালয়ে অবস্থান করিব। তুমি সময়ে সময়ে তোমার কুশল সংবাদ ও যবনগণের অত্যাচারের সংবাদ জ্ঞাপন করিও।" এই বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন। যুবতীও শূন্যমনে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশ্রাম ভবন।

পৃথিবীতে দুই প্রকার কর্ম্ম আছে,—ভাল আর মন্দ। ভাল কাজ করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং অন্তকালে পরমগতি লাভ হয়। মন্দ কাজ করিলে পাপের পথ প্রশস্ত করা হয় এবং অন্তকালে তাহার অনন্ত দুর্গতি হয়,—ইহা আমাদের শাস্ত্রের কথা।

মানব কর্ম্মের দাস, কর্ম্মসূত্রে মানব চিরকাল বাঁধা রহিয়াছে কার্য্য বিনা মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না। তবে কেহ বা কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে সৎকর্ম্ম করিয়া অশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন, আর কেহ হয়ত অসৎ কর্ম্মের দ্বারা অপযশ লাভ করিয়া লোকের নিন্দাভাজন হন,—প্রভেদ মাত্র এই, কিন্তু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এ দুই বিষয়েই আছে। সেনাপতি বিক্রমকেশরী কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে যদিও অখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তথাপি দেশে তাহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহার মৃত্যু কামনা ভিন্ন আর কোনও প্রার্থনা করেন না। পাঠক! ইহা কি প্রতিপত্তি নহে? কার্য্যগুণে ফল, যেমন কার্য্য, তার উপযুক্ত ফল লাভ হইয়াছে। তবে সাক্ষাতে কেহ কিছু বলিতে পারে না, কারণ বিক্রমকেশরী, সাক্ষাৎ বিক্রমকেশরী সিংহ—হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই। "গাছে না উঠিতে উঠিতেই এক কাঁদি" রাজা না হইতে হইতেই এতদূর প্রভুত্ব প্রকাশ না জানি সিংহাসন লাভ করিলে, আরও কি করিবেন। বিক্রম

কেশরী এতদিন নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকায়, এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করিবার সময় পাইতেন না। আজ বহুদিনের পর বিক্রমকেশরী বিশ্রাম ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন।

সেনাপতি বিশ্রাম ভবনে কত কি মনে মনে ভাঙ্গিতেছেন, আবার কত কি গড়িতেছেন। মধুর অধরে সদাই হাস্য বিরাজিত। ভাবী সুখের অবচ্ছায়া মনোমধ্যে উদিত হওয়ায়, আনন্দে অধীর হইতেছেন। এমন সময়ে যমুনা আসিয়া ধীরে ধীরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। সেনাপতি যমুনাকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—"যমুনে! অনঙ্গপাল কি চিরদিনের জন্য দেশত্যাগী হইয়াছে। সে কি আর এদেশে নাই?"

যমুনা উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ! অনঙ্গপাল আজ দুইদিন হইল, কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

বিক্রমকেশরী যমুনার মুখে অনঙ্গপালের পলায়ন সংবাদ শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিলেন,—"যা শত্রু পরে পরে' ছোঁড়াটা থাকিলে হয়ত একটা ফেঁসাদ বাঁধাতো, তা আপনি চুকে গেছে। এইবার লাবণ্যময়ীর বিবাহ লবণ্য আমার বড় হইয়াছে, আর অবিবাহিতা রাখা ভাল দেখায় না। আচ্ছা যমুনা তুই কি লবেণ্যময়ীকে আমার মনোগত ভাব বলিয়াছিলি? সেকি অন্য পাত্রে প্রণয় স্থাপন করতে রাজি আছে। অনঙ্গপালকে সব ভুলিয়া গিয়াছে।

যমুনা বলিলেন,—"সেনাপতি! আপনি যতই কৌশল করুন ভবী ভুলবার নয়। অনঙ্গপালকে তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত করা বড় সহজ কথা নয়। লাবণ্যময়ী তোমার অনঙ্গগতপ্রাণা।

আমি আপনার অনুমতিক্রমে তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে বলে, পিতা আমার প্রাণ সংহারই করুন, আর রাজপ্রাসাদ হইতে বহিস্কৃত করিয়াই দিউন, আমি অনঙ্গপাল ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। তাহাকে আপনার সমস্ত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পর, সে যেরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আমার তিরস্কার কল্লে, তা স্মরণ কল্লেও এখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেনাপতি! আমার পুরস্কারের আবশ্যক নাই, লাবণ্যময়ীর মতি পরিবর্ত্তন করা আমার কর্ম্ম নয়।" এই বলিয়া যমুনা নীরব হইল।

বিক্রমকেশরী যমুনার মুখে আপনার কন্যা সংক্রান্ত অনাচার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধিত সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমারই কন্যা হয়ে, আমারই বাক্য অবহেলা? কন্যা হয়ে পিতার অপমান? দেখি, সে কেমন করিয়া অনঙ্গপালকে পতিত্বে বরণ করে, আমি আজিই অন্য স্থানে পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিব।" পরে যমুনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"যমুনা! তুই পাপিষ্ঠাকে বলিস্ যে বিক্রমকেশরী জীবিত থাকিতে, তাহার সে আশা দুরাশা; আমি প্রাণ থাকিতে কখনই অনঙ্গপালের ন্যায় শৃগালের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিব না।" এই বলিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যমুনাও সেনাপতির কথা সকল লাবণ্যময়ীকে বলিবার জন্য ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

——

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

লাবণ্যের শয়ন কক্ষ।

লাবণ্য সেই দিবস হইতে আর বড় একটা কাহার সহিত কথা কন না, কেবল নিজের কক্ষে নানারূপ চিন্তা করেন, আর প্রাণের প্রাণ অনঙ্গপালের জন্য সময়ে সময়ে মঙ্গল প্রার্থনা করিতে, দেবী-মন্দিরে যান—এই তাঁহার নিত্য কর্ম্ম।

সকল দিবস অপেক্ষা আজ তাঁহার মূর্ত্তিখানি নিতান্তই বিষাদ জড়িত, অন্যান্য দিন তবুও দুই একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিতেন। আজ আর তাহার কিছুই নাই; কেবল দুই চক্ষু হইতে শ্রাবণের জল ধারার ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া, বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। তেমন যে নয়ন মনোহর মূর্ত্তি, তাহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। লাবণ্যময়ী প্রস্ফুটিত সতেজ কুসুম, যেন চিন্তানলে শুখাইতে আরম্ভ হইয়াছে। লাবণ্যময়ী নিদারুণ চিন্তার করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন, কত এ জিনিস সে জিনিস প্রভৃতি আনিয়া দেখিতেছেন। কত সুন্দর পুস্তক আনিয়া পাঠ করিবার উপক্রম করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না. মন কিছুতেই চিন্তাশূন্য হইতেছে না, হৃদয় কিছুতেই সান্ত্বনা মানিতেছে না! যমুনার প্রমুখাৎ পিতার যে নিদারুণ মর্ম্মঘাতী বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, সেই দারুণ আঘাতে তাঁহার কোমল হৃদয়-ভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই এ সকল সান্ত্বনা

বাক্য তথায় স্থান পাইতেছে না, বরং অনলস্থ বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আরও জ্বলিয়া উঠিতেছে। লাবণ্যময়ী যন্ত্রণায় অস্থিরা হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আপনার পাপ স্বার্থসিদ্ধিই কি এত বড় হইল, আর এই অভাগিনী কন্যার প্রতি কি তোমার বিন্দু-মাত্র কৃপা হইল না; কন্যাকে সুখী করা, কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করা যে, পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা কি একবারেই বিস্মৃত হইলেন? পিতঃ! কন্যার ধর্ম্মরক্ষা করা কি আপনার উচিত নয়, তাই আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তা হইবে না, আমি ক্ষত্রিয় কন্যা। আপনিও যদ্রূপ আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, আমিও তদ্রূপ তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। যদি সফলমনোরথ হই—ভাল, নতুবা প্রাণোপম অনঙ্গপালের পবিত্র মুর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তথাপি প্রাণ থাকিতে দ্বিচারিণী হইব না, হৃদয়ে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে কখনই অনঙ্গপাল ভিন্ন অন্য পাত্রে মন প্রাণ অর্পণ করিব না।

পরে কাঁপিতে কাঁপিতে লেখনী ও মসীপাত্র আনয়ন পূর্ব্বক অনঙ্গপালকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আহা মরি মরি! লাবণ্যময়ী,ধন্য তোমার ঐকান্তিক অনুরাগ,ধন্য তোমার ভাল-বাসা। বিবাহ না হইয়াই এত, না জানি বিবাহ হইলে আরও কত হইবে। পাঠক! যদিও লাবণ্যময়ী পিতা কর্ত্তৃক এখন অনঙ্গ-পালের করে সমর্পিতা হন নাই। যদিও লোকে জানে, এখন তাহাদের উভয়ের বিবাহ হয় নাই। কিন্তু মনে মনে তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। নির্জ্জনে দেবতা সাক্ষী করিয়া উভয়ে বিবাহিত হইয়াছেন,—এই বিবাহই যথার্থ বিবাহ। এ বিবাহে কখন

বিচ্ছেদ হইবে না। লাবণ্যময়ী চঞ্চলচিত্তে কত কি লিখিলেন, কত কি ভাবিলেন। কিন্তু তাঁহার একটীও মনে ভাল লাগিল না। শেষে সে গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় নূতন একখানি পত্র লিখিয়া সমাপ্ত করিলেন। পত্রখানি এই;—

প্রিয়তম!

প্রেমিক-হৃদয় সদাই চঞ্চল। সামান্যতে অধীর হইয়া ঘোর যাতনা অনুভব করে। দুই একদিনের অদর্শনে এত কষ্ট, না জানি বিধাতা আরও কত কষ্ট দিবেন। আপনি এস্থান হইতে প্রস্থান করা অবধি, আমার কিছুতেই সুখ নাই, শয়নে স্বপনে কেবল আপনার কুশল চিন্তাই জীবনের সার ব্রত হইয়াছে। অধিনীর শারীরিক সমস্তই কুশল বটে, কিন্তু মানসিক কষ্টের সীমা নাই। প্রাণাধিক! আপনার স্থানান্তরিত হওয়া অবধি এ বাটীর সকলেই আমার বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে আমি অনুমাত্র কাতর নহি; কতদিনে আবার শ্রীচরণ দর্শন পাইব এই চিন্তাতেই অত্যন্ত অধীরা হইয়াছি দাসীকে ভুলিবেন না। যদিও আপনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তথাপি সময়ে সময়ে অভাগিনীর কথা মনে করিবেন শ্রীচরণে দাসীর এই আন্তরিক প্রার্থনা। যবনগণ পুনরায় দেশে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, শুনিতেছি—অচিরেই তাহারা সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করিবে। হিন্দুর দেব দেবীগণের প্রতি তাহাদের অতি-শয় আক্রোশ জন্মিয়াছে। এ রাজ্যে আর আর সমস্তই মঙ্গল বহুদিবস হইতে আপনার কুশল সংবাদ না পাইয়া, জীবন্মৃতা হইয়াছি। শীঘ্র আপনার শুভ সংবাদ লিখিয়া অভাগিনীর জীবন দান করিবেন। আমি এখন অধিকাংশ সময়ই কেলি-কাননের

নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করি। পত্র যেন সেই স্থানেই আমার নামে আসিয়া পৌছায়, নতুবা এ অরিপুরে পত্র আসিলে আমি পাইব না। বরং তাহা অন্যে পাঠ করিয়া আমায় অশেষ লাঞ্ছনা প্রদান করিবে। মন সদাই চঞ্চল, কিছুই ভাল লাগে না, বোধ হয়, পত্র লেখা ভাল হয় নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আর অধিক কি লিখিব.পিপাসিতা চাতকিনীর ন্যায় পত্রের প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় রহিলাম। ইতি—

অনুরাগিণী দাসী

শ্রীমতী লাবণ্যময়ী।

লাবণ্যময়ী পত্রে সমস্ত কথাই লিখিলেন। কেবল তাঁহার পিতার চক্রান্তের কথা, বিক্রমকেশরী যে তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র স্থির করিতেছেন, পত্রে তাহার কিছুই লিখিলেন না, কারণ লাবণ্যময়ী স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার মতে কখনই স্বীকৃতা হইবেন না, তাহাতে প্রাণ যাক্, আর থাক্। এই নিমিত্ত বৃথা পত্রের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া, একখানি খামের ভিতর করিয়া, তাঁহাদের পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য তারাচাঁদের হস্তে দিলেন এবং তাহাকে কয়েকটী মুদ্রা পাথেয় স্বরূপ প্রদান করিয়া তিরিশপল্লি পাঠাইয়া দিলেন! তারাচাঁদ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া তিরিশপল্লি নগরে অনঙ্গপালের উদ্দেশে শুভ যাত্রা করিল। লাবণ্যময়ী তারাচাঁদকে পাঠাইয়া দিয়া প্রাণধারণের মত কিঞ্চিৎ আহার করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! চলুন, এইবার আমরাও একটু বিশ্রাম করি।

——

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পত্র প্রাপ্তি।

পাঠক! আপনারা লাবণ্যময়ীর দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়াছেন। এখন আসুন, একবার আমরা ত্রিরিশপল্লি নগরে অনঙ্গপালের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল, কুমার অনঙ্গপাল ত্রিরিশপল্লী নগরে মাতুলালয় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। একে মানসিক কষ্ট, তাহাতে আবার পথশ্রম,—অনঙ্গপাল মাতুলালয়ে আসিয়াই ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আজ প্রায় তিন চারি দিবস হইল, কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। যে জন্য তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এখানে আসিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে সমাধা করিতে পারেন নাই, তবে দুর্ব্বল শরীরের বশবর্ত্তী হইয়া, যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহার ক্রটি হয় নাই। তাঁহার পিতার পলায়িত সৈন্যগণ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া প্রায় সকলেই আসিয়া যুটিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে মুসলমান বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে পাছে পুনরায় পরাজিত হইতে হয়, এই ভয়ে এখন যুদ্ধঘোষণা করেন নাই।

কুমার অসুস্থতা নিবন্ধন প্রত্যহই প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধ সমীর সেবনার্থ প্রায় দুই তিন ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করেন। অন্যান্য দিবসের ন্যায় আজও কুমার বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ধীর পদবিক্ষেপে মাতুলালয় হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন।

এমন সময় সেনাপতি বিক্রমকেশরীর পুরাতন ভৃত্য তারাচাঁদ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিল। অনঙ্গপাল তারাচাঁদকে দেখিয়াই একটু চঞ্চল হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন,—"সেনাপতি বোধ হয়,তাঁহারে অন্বেষণে চর পাঠাইয়াছেন।" কিন্তু বৃদ্ধ তারাচাঁদ কুমারকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া বলিল,—"কুমার! ভীত হইবেন না, আমি আপনার শত্রুতাচরণ করিতে আসি নাই; লাবণ্যময়ীর আদেশক্রমে এই পত্র লইয়া আসিয়াছি, এই নিন, পত্র পাঠ করুন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ তারাচাঁদ লাবণ্যময়ী প্রদত্ত লিপিখানি কুমারের হস্তে প্রদান করিল অনঙ্গপাল পত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক যথারীতি পাঠ করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। পত্রে লিখিত লাবণ্যময়ীর বিরহ যন্ত্রনায় তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল, নয়নকোণে ধীরে ধীরে অশ্রু দেখা দিল। লাবণ্যময়ীর ভালবাসা যে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি সমভাবে আছে, ইহা পাঠ করিয়া, তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। পরিশেষে বৃদ্ধ তারাচাঁদকে বলিলেন,—"তারাচাঁদ! চল, আমার সহিত আমার মাতুলালয়ে বিশ্রাম করিবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধকে সমভিব্যাহারে লইয়া অনঙ্গপাল মাতুল ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পাঠক! আপনারা হয় ত মনে করিয়াছেন, কুমার লাবণ্যময়ীর অকৃত্রিম ভালবাসা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহা নহে;—আসিবার কালে লাবণ্যময়ীর সেই অশ্রু ভারাক্রান্ত ছল ছল আয়ত লোচন, সেই ভাবী বিরহক্লিষ্টা কমনীয় কান্তি যে অনঙ্গপালের প্রত্যেক শিরায় শিরায় গ্রথিত। সে চারি চক্ষের মধুর মিলন, অনঙ্গপাল কি এ জীবনে কখন ভুলিতে পারিবেন? সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশাকালে, হৃদয়

প্রশান্ত নীলাকাশ তলে উভয়ের প্রেমালিঙ্গন কি ভুলিবার জিনিষ, অনঙ্গপাল ইহজীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। যে প্রেম, সে অনুরাগ,সে নিঃস্বার্থ ভালবাসা,অনঙ্গপালের জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান্ ইহা ভুলিতে গেলে যে প্রাণে আঘাত লাগে। লাবণ্যময়ী অনঙ্গ প্রেমে যতদূর উন্মত্তা, বোধ হয় অনঙ্গপাল তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। তবে তিনি ক্ষত্রিয় সন্তান—বীরপুরুষ; কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে সকলই সহ্য করিতে হইতেছে। তাই তিনি লাবণ্যের ন্যায় এত উদ্ভ্রান্ত হইতে পারেন নাই। নতুবা আহারে, বিহারে তিনি লাবণ্যময় দেখিতেন এমন কি ঘুমের ঘোরে কখন কখন তাঁহার অদেরের প্রাণ "মরি! মরি" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেন। কোন কোন দিন লাবণ্যসংক্রান্ত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। ভাবুক অনঙ্গপাল সেই সকল প্রাণারামকারী অদ্ভুত স্বপ্নের ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। যদি কখনও ভাগ্যক্রমে লাবণ্যময়ীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহা হইলে এই সকল দেখাইয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। যাহার ভালবাসা এতদূর দৃঢ় হইয়াছে, যিনি ভালবাসা কি অমূল্য জিনিষ চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি কেমন করিয়া এই সামান্য দিনের মধ্যে ভুলিয়া যাইবেন। ভাবুকপ্রবর, সত্যসন্ধ, ক্ষত্রিয়বীর অনঙ্গপাল কখন ইহা ভুলিতে পারিবেন না। আর এই বিশাল পৃথিবী মাঝে এমন সংযতচিত্ত সাধু পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না, যিনি এই সরলপ্রাণা যুবতীর নিঃস্বার্থ, পরম পবিত্র প্রণয় অনন্তরে বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত করিতে পারেন। এমন জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যদি

এই কলিকালে রামানুজ লক্ষ্মণের মত দৃঢ়ব্রত জিতেন্দ্রিয় থাকেন তাহা হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে। কেমন, পাঠক মহাশয়ের এমন সাধুপুরুষ নয়নগোচর হইয়াছে কি ?

অনঙ্গপাল তারাচাঁদকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। লিখনোপযোগী সরঞ্জাম বাহির করিয়া লাবণ্যময়ীর পত্রের প্রতিউত্তর লিখিতে বসিলেন। লাবণ্যময়ীর অভিনব প্রণয়কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রেমোচ্ছ্বাসে উছলিয়া উঠিতেছিল। হৃদয়ের আবেগে কত কি লিখিলেন, লিখিতে লিখিতে অশ্রুজলে দুইতিনখানি পত্র ভিজিয়া গেল। পরে হৃদয়ের আবেগ কিয়ৎ পরিমাণে সাম্য করিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রের প্রত্যুত্তর খানি এই—

প্রাণাধিকে !

তারাচাঁদের নিকট হইতে তোমার প্রেরিত প্রণয় লিপি পাইয়া বার বার চুম্বন করতঃ হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি আমি শারীরিক অসুস্থ থাকায় তোমার কোন সংবাদ লইতে পারি নাই। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মানসিক কষ্ট ও পথশ্রমবশতঃ আমি মাতুলালয়ে আসিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলাম। এখন তোমার কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য কোনরূপ চিন্তা করিয়া আপনাকে কষ্ট দিও না। আমার আগমন সংবাদ পাইয়া পিতার পলায়িত সৈন্যগণ অধিকাংশই এখানে আসিয়া জুটিয়াছে আমি অতি শীঘ্র যবন বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব। অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা অবশ্য ঘটিবে, তন্নিমিত্ত কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে। দুই একদিনের

মধ্যেই আমি সসৈন্যে সোমনাথের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিব প্রিয়তমে! কেন বৃথা সন্দেহ দোলায় দুলিয়া এত আকুলিতা হইতেছ। অনঙ্গপাল লাবণ্যময়ী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। এ সংসার অম্বরে তুমিই আমার পূর্ণশশী, তোমার ভাবী প্রণয়ের প্রতি তাকাইয়াই আজি জীবন ধারণ করিতেছি। লোকে শয়নে স্বপনে যেমন আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করে তদ্রূপ তুমিও আমার জপমালা হইয়াছ। শয়নে স্বপনে তোমার চিন্তাই আমার প্রধান চিন্তা হইয়াছে। তোমার অদর্শনে যে আমার কত কষ্ট হইতেছে তাহা এই সামান্য পত্রে আর কি লিখিব। তবে পীড়িত অবস্থায় একদিন রজনীযোগে যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পরদিন প্রভাতে তাহা আনুপূর্ব্বিক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি. এই পত্রে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতেই জানিতে পারিবে. অনঙ্গপাল লাবণ্যময়ী ভিন্ন অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেয় না. পাঠক মহাশয়! আপনারাও এই অবকাশে অনঙ্গপালের পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় লউন। অনঙ্গপাল পত্রের সহিত নিম্নলিখিত স্বপ্ন দুষ্ট সুললিত কয়েক চরণ পদ্য লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন :—

১

একদা বসন্তকালে গভীরা যামিনী,
মৃদুমন্দ বহিতেছে মলয় পবন ;
নীরব নিস্পন্দভাব ধরেছে মেদিনী,
জীব জন্তু সবে আছে ঘুমে অচেতন।

২

জাগরিত নাহি কেহ মরত ভুবনে,
কেবল চন্দ্রমা জাগি গগনের ভালে ;

বিতরিছে করজাল তারাদল সনে,
আরামে নিদ্রিত জীব নিদ্রাদেবী-কোলে।

৩

আমিও নিদ্রার কোলে শান্তি লভিবারে,
শুয়েছিনু প্রিয়াসনে দীন শয্যোপরি ;
দিবসের মর্ম্ম জ্বালা ভুলিবার তরে,
যাহারে স্মরিলে হৃদি কাঁপে থরথরি।

৪

সহসা জাগ্রত হয়ে ভীষণ স্বপনে,
উঠিয়া বসিনু আমি প্রেমময়ী পাশে ,
মৃদুমন্দ গন্ধ বহে হৃদি পরশনে,
হইল আরাম দেহ নব নব বাসে।

৫

গবাক্ষ হইতে পশি স্নিগ্ধ করজাল,
হয়েছে আঁধার গৃহ অতি আলোময় ;
তোমার বিষাদময়ী বদন কমল,
হইয়াছে সে কিরণে চারু শোভাময়।

৬

আরামে নিদ্রিতা সতী অভাগার পাশে,
দিবসের মর্ম্ম জ্বালা ভুলেছে সকল ;
পৃথিবীর দ্রব্য কিছু ভাল নাহি বাসে,
পতির চরণ সেবা জানে সে কেবল।

৭

হায়রে অধম আমি ঘোর পাপাচারী,
নাহবে প্রভাত বুঝি দুঃখ নিশি মোর ;
তাই এ সরলা সতী পতিপ্রাণা নারী,
আমা তরে ভুগিতেছে যন্ত্রণা অপার।

৮

আলুথালু হয়ে এবে কবরী বন্ধন,
তৈলাভাবে সে কেশের নাহি চিকণতা ;
নিদ্রায় বিভোরা দেবী মুদিত নয়ন,
দেখি নাই কভু আমি হেন পতিব্রতা।

৯

হায় সতী কেন বৃথা হেন অভাগারে,
বরেছিলে পতি বলে মোহের ছলনে ;
তাই এ দুঃসহ কষ্ট সহ বারে বারে,—
ধরি পূত পতি ভক্তি সরল পরাণে।

১০

ভিখারী ঘরণী বলি হায় প্রাণেশ্বরি।
নাহি কিলো আস্থা তব আপন শরীরে ?
দেখিলে তোমার দশা চক্ষে বহে বারি,—
মৃত্যু ইচ্ছা হয়, যাহে শান্তি পায় নরে।

১১

এইরূপে বিলাপিনু আমি বিধিমতে,
ফোটা কয় অশ্রু বিন্দু ঝরিল নয়নে ;

গণ্ড বাহি সেই নীর পড়িল গাত্রেতে,—
সহসা জাগিলা প্রিয়া হরষিত মনে।

১২

কেন প্রাণকান্ত তুমি কহিলা রূপসী,
এ ঘোর নিশিতে জাগি কেন অকারণ ;
আত্মনিন্দা কর দেব অশ্রুজলে ভাসি,
পদে ধরি বৃথা আর করোনা রোদন।

১৩

বিধি দিয়াছেন দুঃখ আমা দোঁহাকারে,
কি দোষ তোমার, ধৈরজ ধরিয়া কান্ত ;
মঙ্গলময়েরে ডাক সরল অন্তরে,—
বৃথা কেন দুঃখে পড়ি হইতেছ ভ্রান্ত ?

১৪

গুণশীল তুমি নাথ অধিনীর প্রাণ,
সফল হইল নারী জনম আমার,—
সেবা করি অহরহ তব শ্রীচরণ ;
তুমিই সর্ব্বস্বমম জীবনের সার।

১৫

পতি বিনা সতী আর কিছু নাহি জানে,
অরাধ্য দেবতা মম ধন প্রাণধন ;
তুচ্ছ ভাবি ব্রহ্মপদ এ নারী জীবনে,—
মোক্ষপদ মম এই যুগল চরণ।

১৬

মহা ভাগ্যবতী আমি শুন প্রাণেশ্বর ?
দিবানিশি সেবি তাই তোমার চরণ,
ও চরণ বিনা কিছু জানিনাক আর,—
সতী পক্ষে স্বামী পদ অমূল্য রতন।

১৭

আশীর্ব্বাদ কর দেব ধরি শ্রীচরণে,
জন্মে জন্মে হই যেন তব পদে দাসী ;
ইহা ছাড়া অন্য ইচ্ছা নাহি লাগে মনে,
সেবিতে তোমার পদ বড় ভাল বাসি।

১৮

অতুলনা হে ললনা পতিভক্তি তব,
কহিনু সহর্ষে আমি চাহি সতী পানে,
অশেষ যাতনা যত ভুলিনু সে সব,—
কে যেন শান্তির সুধা ঢালিল পরাণে।

১৯

তব সম পতিপ্রাণা পত্নী আছে যার,
সেই প্রিয়ে সুখী এই দুঃখময় ভবে ;
স্বর্গের অনন্ত সুখ ভাবে সে অসার,—
বিমোহিত আমি তাই মজে তব ভাবে।

২০

বাস্তবিক এ সংসারে স্বর্গের সমান,
সংসারিক প্রথা সব পালিয়া চলিলে ;

সংসার অপেক্ষা স্থান নাহিক প্রধান,
ইহাতেই মোক্ষ নর পায় অন্তকালে।

২১

এ সংসারে তব সম লক্ষ্মী পত্নী যার,
কি অভাব তার প্রিয়ে সুখের সংসারে;
স্বরগ অপেক্ষা গৃহ গরীয়সী তার,—
অমরেও বাঞ্ছা সদা করে যার তরে?

২২

ধন্য তুমি ধন্য তব সতীত্ব ধরম,
না দেখি তুলনা তব মরত ভুবনে;
তব গুণে অত্যুজ্জ্বল এ সংসার মম,
তব প্রেমে বাঁধা আমি জীবনে মরণে।

২৩

এইরূপে তব সনে বসি একাসনে,
আনন্দে যাপিনু সেই সুখের রজনী।
তাই বলি,—পত্নী সম কে আছেরে নিখিল ভুবনে,
সুখে দুঃখে হবে আর জীবন সঙ্গিনী।

অনঙ্গপাল পত্র সমাপ্ত করিয়া তারাচাঁদের হস্তে অর্পণ করিলেন। তারাচাঁদ আহারাদি সমাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল কুমার তারাচাঁদকে বিদায় দিয়া যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। লাবণ্যময়ী পত্রে যুদ্ধের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলেন অনঙ্গপাল আপন সেনাগণের মধ্যে অবগত করাইলেন এবং তাহাদিগকে শীঘ্র২ প্রস্তুত হইতে অনুমতি দিলেন। সৈন্যগণ কুমারের আদেশক্রমে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল।

——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•—

পাত্র স্থির হইল।

এদিকে বিক্রমকেশরী আপন কন্যার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করণে দৃঢ়ব্রত হইয়াছে। যাহাতে অনঙ্গের সহিত লাবণ্যময়ীর পরিণয় না হয়, এই জন্য তিনি বিল্লপুরে এক মনোমত পাত্র আনিয়াছেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, কিন্তু লাবণ্যময়ীকে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেওয়া হয় নাই, হইবেও না। চুপে চুপেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করা হইবে। পিতা হইয়া কন্যার পণ ভঙ্গকরণার্থে, কন্যাকে আজীবন দুঃখস্রোতে ভাসাইবার জন্য এত ষড়যন্ত্র, এত কৌশল। সরলা বালা লাবণ্যময়ী অহোরাত্র কেবল প্রবাসী অনঙ্গপালের কুশল চিন্তায় দেহপাত করিতেছেন। এখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, ভিতরে ভিতরে তাঁহার পিতা তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

হায়! বিক্রমকেশরি! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া এ কি করিলে। যে ক্ষত্রিয় পরের জন্য, দেশের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, নিজ অবলা কন্যার প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ ধীর এবং বীর, তাহারাকি কখনওঅবলা জাতির প্রতিআক্রোশ প্রকাশ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করে? ছি! ছি! তুমি ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য, তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের নাম করিলেও পাপ হয়।

ইহা অপেক্ষা লাবণ্যময়ীর প্রাণসংহার করা ভাল ছিল যে, পাপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেন হলাহল পান করিয়া প্রাণে মরিবে, অশেষ পাপ সঞ্চয় করিবে? ক্ষান্ত হও! বিক্রমকেশরি! তুমি কি জান না, এক সমুদ্র দুই তিনবার মন্থন করিলে, তাহা হইতে গরল উত্থিত হয়। লাবণ্যের হৃদয়-সমুদ্র যে, অনঙ্গ-প্রণয়-দণ্ডে মথিত হইয়াছে, পুনরায় তাহা মন্থন করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ হইবে। লাবণ্য-হৃদয় নিশ্চয়ই গরল উদ্গীরণ করিবে, নিশ্চয়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে, তখন পাষণ্ড! তোর দুর্গতি কি হইবে? সে সতী-রোষরূপ হলাহল হইতে তোকে কে বাঁচাইবে? স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবই যখন সেই বিষে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তখন তুই কোন ছার; দুরাত্মন্! নিশ্চয়ই তোকে সেই রোষ হলাহলে ভস্ম করিবে। তখন তোকে কে রক্ষা করিবে? তুই সতীহত্যাকারি! সতীশিরোমণি মা জগজ্জননী তোর বিপক্ষ, তিনি রুষিলে কাহার সাধ্য, মূঢ়! তোকে রক্ষা করে? কিন্তু লোকের মতিভ্রম উপস্থিত হইলে, তাহার পরিণাম বিবেচনা থাকে না, ধর্ম্মের পথে মতি কখনই অগ্রসর হয় না, আপততঃ মধুর পাপ পথেই তাহার মতি অগ্রসর হইতে থাকে—কোন বাধাই মানে না। বিক্রমকেশরী পেশোয়ার হইতে এক পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহার বিবেচনায় ইনিই সর্ব্বতোভাবে লাবণ্যময়ীর উপযুক্ত পাত্র। পাত্রের নাম জীবনকিশোর, ইনি যদিও অনঙ্গপালের ন্যায় রাজপুত্র নন, তথাপি এখন ইহার অতুল বিষয়, ধনবান পাত্রে কন্যা অর্পণ করিলে, কন্যা আজীবন সুখভোগ করিবে, পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করা হইবে। এই জন্যই সেনাপতি বিক্রমকেশরী এই পাত্রে কন্যা সম্প্রদান

করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, এই জন্য এই বিবাহের এত ষড়যন্ত্র। কিন্তু বিক্রমকেশরী জানেন না যে,সুখ ঐশ্বর্য্যে হয় না সুখ মনে; মন যাহা চায়, তাহা না পাইলে, কেমন করিয়া সুখ হইবে। হায়! সে কথা শুনে কে? পরিণামবিবেচনাশূন্য বিক্রমকেশরী কন্যার ভাবীসুখের জন্য অস্থির হইয়া, কুমার জীবনকিশোরের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাঠক! আপনারা এই নূতন পাত্রের নাম স্মরণ রাখিবেন, পরে ইহার বিষয় কিছু বলিব।

চুপে চুপে বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। লাবণ্যময়ী তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

অনঙ্গের পত্র।

লাবণ্যময়ী এখন সমস্ত দিনই অনঙ্গপালের নাম, অনঙ্গপালের কথা, অনঙ্গপালের মঙ্গল চিন্তা লইয়াই কালাতিপাত করেন। যদিও লাবণ্যময়ী এখনও কোন বিষয় জানিতে পারেন নাই। যদি এখনও তাঁহার স্থির বিশ্বাস, অনঙ্গই তাঁহার প্রাণেরঅধীশ্বর তথাপি তিনি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই. অনঙ্গ বিরহ-বাণে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইতেছে। লাবণ্যময়ী এখন সদা সর্ব্বদাই বিষাদময়ী. সে লাবণ্যময়ী সরলা বালার চন্দ্রমা সদৃশ বদনমণ্ডল যেন চিন্তা-রাহুর করাল কবলে পতিত হইয়াছে—সে মুখে আর হাসির তরঙ্গ নাই, সে চঞ্চল চক্ষে আর কটাক্ষ নাই। কবিরা যে চক্ষুকে হরিণ নেত্রের সহিত চঞ্চল বলিয়া তুলনা করিতেন। সেই চক্ষু আজ স্থির, নিশ্চেষ্ট, পলকবিহীন। দেহের সে কান্তিও নাই. তরুচ্যুত লতা যেন উন্মূলিতা হইয়াছে। অনঙ্গপালের জন্য—পোড়া ভালবাসার জন্য; সে সোণার প্রতিমায় ঘুণ ধরিয়াছে। যত দিন যাইতে লাগিল, সে লাবণ্যকুসুম যেন ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে লাগিল।

লাবণ্যময়ীর এখন আপন শরীরে তত আস্থা নাই, এখন তিনি আর বেশবিন্যাস করেন না। অপরিষ্কৃত হইয়া চাঁচর চিকুরগুচ্ছে জটা বাধিয়া যাইতেছে। সময়ে আহার করেন না, সময়ে নিদ্রা যা'ন না। মন যে উড়ু উড়ু করিতেছে, কিছুই

ভাল লাগে না। তবে অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ তাঁহার বদন সুপ্রসন্ন, মন যেন কতক পরিমাণে চিন্তা রাক্ষসীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

বৈকালে রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। দিবাকর সমস্ত দিন কিরণ বিতরণ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম বোধ হওয়ায়, পশ্চিম গগণে ঢলিয়া পড়িতেছে, তাঁহার লোহিতবর্ণ কিরণ এখন গাছের পাতায়, গৃহের ছাদে একটু একটু দেখা যাইতেছে। দিবাবিহারী পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায় গমন করিবার আগে গাছের ডালে দল বাঁধিয়া কলরব করিতেছে। লাবণ্যময়ী সমস্ত দিন গৃহে বসিয়াছিলেন, এই সময় একবার সান্ধ্য-মরুত হিল্লোলে প্রাণ মন যুড়াইতে কেলিকাননে আসিয়া বসিলেন। হাতে সেই অনঙ্গপালের প্রেরিত পত্রখানি, বৃদ্ধ তারাচাঁদ ফিরিয়া আসিয়া লাবণ্যময়ীকে পত্র প্রদান করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পত্র প্রাপ্ত হইয়াই দুই তিনবার পড়িয়াছিলেন। কেলিকাননে আসিয়া, পুনরায় সেই পঠিত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন—পাঠ করিতে করিতে চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িল। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন—"অনঙ্গ! প্রাণাধিক! তবে তুমি আজও এ হতভাগিনীকে ভুলিতে পার নাই; প্রিয়তম! তুমি ভুলিলে আর আমার কে আছে, তুমি যে আমার উপাস্য দেবতা, ভব-পারের কাণ্ডারী, হৃদয়ের বন্ধু, বিপদের সখা, সংসার সমুদ্রের একমাত্র তরণী, তোমা বিহনে আমি আর কাহার মুখপানে চাহিব?" এই বলিয়া পত্রখানি বার বার সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই পত্রখানিই এখন লাবণ্যের সহায়, তাঁহার বিরহবিধুর হৃদয় যুড়াইবার ইহাই একমাত্র উপায়,

তাঁহার জীবনের সার সম্বল। হায় প্রণয়! তোমাকে কে রত্ন বলিয়া সম্বোধন করে? সহস্র সহস্র উপাসক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, তোমায় তুষ্ট করিতে পারে না। তুমি কদাচিল্লভ্য। তোমার আশ্রিতেরা চিরকাল কাঁদে। হা মৃগতৃষ্ণে! তোমাকে এ মনভুলান প্রলোভনে কে সাজাইল? তোমার হৃদয় এত কঠিন যে, কোমল কমলকে দলিত করিয়াও তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগে না। হা পাগল মন! তুমিই বা কেন এত সহজে আত্মহারা হইয়া যাও, কেনই বা তোমার আশ্রিত মানবকে এত কষ্ট দাও। অনঙ্গগত প্রাণ সরলা লাবণ্যময়ীকে আর কত কাল এমন করিয়া দগ্ধ করিবে। এই শত্রুপুরী মাঝে তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিবার কেহই নাই,একমাত্র অনঙ্গপাল ছিল, সেও এখন বিদেশগত। তবে আর তাহার প্রতি এত প্রকোপ কেন,ক্ষান্ত হও।লাবণ্যময়ী অনেকক্ষণ আসিয়াছেন, পাছে কেহ তাহার এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই ভয়ে আর কাল বিলম্ব না করিয়া, অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের বিড়ম্বনা।

আজ আমাদের লাবণ্যময়ীর বিবাহ। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। লাবণ্যময়ী প্রত্যেক দিনের ন্যায় আজও কেলি-কানন যাইবার উপক্রম করিতেছেন। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া লাবণ্যময়ীকে ডাকিল, লাবণ্যময়ী বাহিরে আসিলেন। দাসী বলিল—"তোমার মা আমাকে চুল বাধিতে পাঠাইয়া দিলেন, আমি তোমার চুল বাধিয়া দিব।" লাবণ্যময়ী বলিলেন—"না আমার চুল বাঁধিতে হইবে না।" কিন্তু কে কাহার কথা শুনে, দাসী কথা শুনিল না। লাবণ্যময়ী অনেক আপত্তি করিলেন, দাসী ছাড়িল না লাবণ্য আর কিছু বলিলেন না, সে লাবণ্যের ঘনকৃষ্ণ নিবিড় কেশরাশি লইয়া জটা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল। যমুনা এতদিন ভয় পাইয়া লাবণ্যের কাছে আসে নাই, আজ সময় পাইয়া নিকটে আসিয়া বসিল। লাবণ্যময়ী যমুনাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিলেন—"যমুনে! তুই এতদিন ছিলি কোথা?" যমুনা জানিত না যে, বিবাহ কার্য্য লাবণ্যময়ীর অজ্ঞাতসারে হইতেছে। সে বলিল—"সখি! সে দিন অবধি তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ বলিয়া, আমি আর আসি নাই। ভাই! আমার কি দোষ. তোমার বাপের ইচ্ছা অন্য পাত্রে তোমার বিবাহ দেন, আর হইলও তাই এখন তুমি সুখী হইলেই আমাদের সুখ।"

লাবণ্যময়ীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, চমকিতা ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিলেন—"কি হইল রে যমুনা!"

যমুনা—"আর ভাই! লুকাও কেন আজ রাত্রে যখন রাজপুত্রের বামে বসিবে, তখন কি আর এই যমুনার কথা মনে থাকিবে?" লাবণ্যময়ী কিছুই ভাল বুঝিতে পারিলেন না, যারপরনাই উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বলিলেন—"কাহার সহিত বিবাহ হইবে, পাত্র কোথাকার?"

যমুনা—"কেন, তুমি কি কিছু জান না, পেশোয়ারের রাজা শ্যামকিশোরের সহিত, আজ তোমার বিবাহ হইবে।"

লাবণ্য, মনে মনে ভাবিলেন,—কি সর্ব্বনাশ! পিতা আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য, সকল কথাই গোপনে রাখিয়াছেন। ভাগ্যে যমুনা ছিল, তাই ত কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংবাদ পাইলাম, যমুনা! তুই আমার শত্রু নয়, তুই আমার প্রতি যথার্থ সহচরীর ন্যায় ব্যবহার কল্লি, তোর্ ঋণ আমি কখনও শুধিতে পারিব না।

লাবণ্যময়ীর পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল সহসা রক্তিমাবর্ণ হইল, আবার কিছুক্ষণ পরেই তাহা আরও পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, আয়ত লোচন দুইটী জলে পরিপূর্ণ হইল। দাসী লাবণ্যময়ীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিল, "তার আর চিন্তা কি! যখন তোমার বাপ তোমার বিবাহ দিতে জেদ কচ্চেন. এখন কি তোমার অমত করা উচিত?" লাবণ্যময়ী কোন কথাও কহিলেন না এ প্রবোধ বাক্য তাহার কর্ণে আদৌ প্রবেশ করে নাই। লাবণ্যময়ী বীর-রমণী, বিপদে অধীরা হইলে. তাহার শত্রু হাসিবে, কত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে; সে উপহাস, সে লোক গঞ্জনা, এ সময়ে

তাহার অসহ্য হইবে; এই ভাবিয়া তিনি সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কম্পিত ও উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন; যমুনে! প্রিয় সখি! তুমি আমার শত্রু নও, এ অরিপুরে তুমিই আমার পরম সুহৃদ। এই বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবিলেন,—"এখন কি করি, এই অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় গিয়া আত্মরক্ষা করি, এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে লাবণ্যময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, হে অনাথ নাথ! এ অভাগিনীকে অনাথিনী করাই কি তোমার ইচ্ছা, আমি যে, অনঙ্গপাল ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, তিনিই যে আমার ধ্যান জ্ঞান ও জীবনের সহায়, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া অন্যে প্রাণ, মন সমর্পণ করিব, কেমন করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া অসতী হইয়া চিরকাল তরে কলঙ্ক-সাগরে অবগাহন করিব। এই বলিয়া ঘোর চিন্তায় অভিভূতা হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সেনাপতি ভবনে বিবাহের মহাধুম পড়িয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দুই দণ্ড হইল, মহা সমারোহে বর ও বরযাত্র আসিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিল। সকলে ঐ বর আসিয়াছে, ঐ বর আসিয়াছে বলিয়া, বর দেখিতে ছুটিল, বিবাহের ঐক্যতান বাদনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেবল যাহার বিবাহ, তাহার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। তিনি ঘরের ভিতর পড়িয়া কেবল মনের জ্বালায়, প্রাণের জ্বালায় ছটফট করিতেছেন। এতক্ষণ সেনাপতির নিষেধ ছিল বলিয়া, কেহ সে গৃহে যায় নাই, এখন বিক্রমকেশরীর অনুমতি পাইয়া সেই ঘরে ছুটিয়া গেল. আবার অনতিবিলম্বেই সকলে

ফিরিয়া আসিয়া বলিল; লাবণ্যময়ী গৃহে নাই। বিক্রমকেশরী মহাবিব্রতে পড়িলেন। তাহার পরে সকলে মিলিয়া অন্তঃপুরের প্রতি গৃহে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। শেষে বাহিরে আসিয়া এ কথা প্রকাশ করিলেন, চারিদিকে লোক ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে ফিরিয়া আসিল, কেহই লাবণ্যের সাক্ষাৎ পাইল না সে সোহাগ-সৃজিত প্রেমের ফুলটী আর কাহারও নয়নগোচর হইল না। সেনাপতি যারপরনাই অপ্রতিভ হইলেন। বর মহাশয়ের এত আশা ভরসা, এত আমোদ আহ্লাদ সকলই নিমেষের মধ্যে ফুরাইয়া গেল। সে জনতা—সে আমোদ প্রমোদ সকলই দুঃখে পরিণত হইল। পরে সকলে আহারাদি করিয়া, মনের দুঃখে শয়ন করিলেন। পাঠক মহাশয়! আপনাদের মধ্যে অনেকেই মহাভারতে রুক্মিণী হরণের বিষয় পাঠ করিয়াছেন। চেদিরাজ শিশুপাল যেমন ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণীর পাণিগ্রহণার্থে আগমন পূর্ব্বক ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের লাবণ্য-প্রণয়প্রার্থী জীবনকিশোরও তদ্রূপ প্রভাত হইতে না হইতে রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। লাবণ্যের জননী, যমুনা প্রভৃতি বাটীর সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বিক্রমকেশরীর অপমানের একশেষ হইল, সে দুঃখ, সে রাগ সমস্তই গিয়া গরীব বেচারি তারাচাঁদের উপর পড়িল, তিনি মনে মনে তাহারই উপর রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"এটাই যত নষ্টের গোড়া, বেটাই অনঙ্গপালের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

নিরুদ্দেশ।

লাবণ্যময়ী ঘরের ভিতর পড়িয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে স্থির করিলেন এখন পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিলেত চলিবে না, ইহার একটা উপায় করা আবশ্যক; কিন্তু কি উপায় করিব কোথায় যাইব লাবণ্যময়ী চিন্তায় বিভোর হইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিলেন, কোথাও কিছু উপায় দেখিতে পাইলেন না। শেষে ভাবিলেন মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই; এখানে থাকিলে আর দুই দণ্ড পরেই তাহার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাকে জালবদ্ধ হইতে হইবে; তখন আর শত চেষ্টায়ও সে ভয়ানক জাল হইতে উদ্ধারের আশা নাই অতএব আর এখানে কাল বিলম্ব করা উচিত নয়, অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। এই স্থির করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সাহস ভর করিয়া একবার চারিদিক অবলোকন করিলেন; সম্মুখস্থিত বৃহন্মুকুরে তাঁহার সেই নয়ন মনোহর প্রতিবিম্ব পড়িল। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন— "রূপ! আজ তুমি এত পরিষ্কার কেন? যিনি তোমাকে পরিষ্কার দেখে ভালবাসেন, তিনিত এখানে নাই? অলঙ্কার! তোমরা আর কেন এ দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছ। যার জন্য তোমাদের শোভা, তিনিত আর এদেশে নাই, এখন এখানকার সকলেই আমার শত্রু, তোমরাও এখন আমার শত্রুমধ্যে·

গণ্য, ধর্ম্মপথের কণ্টকস্বরূপ ; আর তোমাদের প্রয়োজন নাই, তোমরাও দূর হও!" এই বলিয়া অলঙ্কার সকল উন্মোচন করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পরিহিত মহামূল্য বসনখানি ছাড়িয়া, একখানি জীর্ণ বসন পরিধান করিলেন যেন পূর্ণচন্দ্রকে কাল মেঘে আবরিত করিল। একবার অনঙ্গপালের পবিত্র প্রণয়ের কথা স্মরণ করিয়া, লাবণ্যময়ী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন,—হাতে সেই অনঙ্গের প্রেরিত প্রেম পত্রখানি, এই খানিই তাঁহার পথের সম্বল। একাকিনী গৃহ বহির্গমন কালে, ইহাই তাঁহার সহায় এবং যত দিন না অনঙ্গপালের সহিত সাক্ষাৎ হয়, ততদিন এই পত্রই তাঁহার মনের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল।

লাবণ্যময়ী যদিও গৃহ হইতে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু কেমন করিয়া যাইবেন, পদ যে পদান্তরে যাইতে চাহে না। যেখানে বাল্যকাল হইতে লালিতা পালিতা হইয়াছেন; যেখানে তাঁহার জীবনের আশা; ভরসা, স্নেহ, প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে ; যেখানকার পশু পক্ষি, নদ নদী, গাছ পালা, তড়াগ পুষ্করণী ; তাঁহার সুখে সুখী. তাঁহার দুঃখে দুঃখী, এমন কি যেখানকার এক গাছি সামান্য তৃণও তাঁহার এত আদরের বস্তু, সকলেই তাঁহার আপনার। লাবণ্য দেখিল, তাঁহার সেই স্নেহময়, আনন্দময় আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া না গেলে, আর উপায় নাই, লাবণ্যময়ী হতাশ প্রাণে; অশ্রুমাখা নয়নে পুনরায় চারিদিক চাহিলেন। বাটির দরজা, জানালাগুলি, কেলিকাননের প্রত্যেক গাছের পাতাটী ফুলটী পর্য্যন্ত সে অতৃপ্ত নয়নে, আগ্রহ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার এত দুঃখের মধ্যে

বাল্যের ধূলা খেলা কৈশোরের হর্ষ বিষাদ, যৌবনের অশ্রু নিরাশা প্রভৃতি আজীবনের শত সহস্র স্মৃতি মনোমধ্যে ক্ষণেকের জন্য জাগরিত হইয়া,—আবার লীন হইয়া গেল, লাবণ্যময়ী বাধা প্রদান করিবার জন্য স্নেহের শত বাহু প্রসারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে প্রবল স্রোতে বাধা প্রদান করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সে প্রণয় কুহকের মনোন্মাদকারী ইন্দ্রজালকে অতিক্রম করিতে পারে? দুর্ব্বলা বালার সাধ্য কি যে তাহা অতিক্রম করেন?

লাবণ্যময়ী আর দাঁড়াইলেন না, তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন সেনাপতির সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনাথিনী।

সুখ আর দুঃখ; এরা দুই ভাই। যেমন আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য দুই ভাইয়ে পর্য্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রি করেন। সুখ ও দুঃখও তেমনি ভাগ্যাকাশে দুঃখরূপ অন্ধকার ও সুখরূপ আলোক বিতরণ করেন। আকাশ যেমন কখনও মেঘে আবরিত, কখনও পরিষ্কার থাকে। ভাগ্যরূপ আকাশও তদ্রূপ. কখন দুঃখরূপ মেঘআচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার হয়, কখন বা সুখের স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত থাকে। ইহা কখন শূন্য পড়িয়া থাকে না, হয় সুখ না হয় দুঃখ; একটা না একটা থাকিবেই থাকিবে। ভাগ্যাকাশে প্রথম দুঃখের উদয় হওয়াই ভাল, তাহাতে অনন্ত সুখ। আজীবন দুঃখভোগী কিম্বা আজীবন সুখভোগী ব্যক্তি জগতে নিতান্তই বিরল। যিনি দুঃখ ও সুখ উভয়েই ভোগ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সুখী, সুখের আস্বাদন তিনিই কেবল অনুভব করিতে পারেন। সুখভোগ করিয়া যিনি দুঃখভোগ করেন, তিনি নিশ্চই হতভাগ্য, আর দুঃখ ভোগ করিয়া যিনি সুখী হন, তিনি স্বনাম পুরুষ ধন্য. তাহার সুখ অনন্তকালস্থায়ী। তাই কোন মহাকবি লিখিয়া গিয়াছিলেন—"ছোট হবি ত বড় হ, বড় হবি ত ছোট হ।" নতুবা বড় হইবার উপায় নাই। দুঃখ

না ভোগ করিলে সুখ কোথায়; ক্ষতি না হইলে পূরণ কোথায় বিরহ না হইলে প্রেমের ফল ফলিবে কিসে?

আজ আমাদের লাবণ্যময়ীর ভাগ্যাকাশে ঘোর যাতনাদয়ক দুঃখ মেঘের উদয় হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়াছে। চির-সুখ-পালিতা লাবণ্যময়ী আজ দুঃখের অপার সমুদ্রে ভাসমানা, কবে যে কুল পাইবেন, তাহার ঠিক নাই। আশাশূন্য প্রাণ, সুখশূন্য জীবন—আরাধ্য দেবতাশূন্য হৃদয়-সিংহাসন অভাগিনী আর কত কাল বহন করিবে। আশার আশ্বাসে আর কত কাল এই কষ্টকর জীবন ধারণ করিবেন।

জগতে সকল দ্রব্যই গতিশীল, কিন্তু সীমাবদ্ধ, সীমা অবধি গমন করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। লাবণ্যময়ীর বিরহ দুঃখ পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে, কিন্তু শেষ কষ্টই ভয়ানক কষ্ট। লাবণ্যময়ী এই দুঃখ রাশির মধ্য দিয়াও যেন মানসচক্ষে ক্ষীণালোক দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কাহার আশ্রয় লইবেন—কে তাহাকে তাহার হৃদয়রতনের সন্ধান বলিয়া দিবে, তাঁহার এই মহা চিন্তা হইয়া উঠিল। বিবাহের পর চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত হইয়াগিয়াছে,ক্রমে ক্রমে আজিকার রজনীও প্রভাত হইল অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও কাক কোকিল সকল স্ব স্ব রব করিতে করিতে ইতস্ততঃ,ধাবমান হইতে লাগিল। গাছের রাশির মধ্য দিয়া একটু একটু রৌদ্র আসিয়া লাবণ্যময়ীর বিষাদসিক্ত মুখখানির উপর পড়িল লাবণ্যময়ী এতক্ষণ একটী বৃক্ষতলায় পড়িয়াছিলেন,এখন উঠিয়া বসিলেন; বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এইত চারি পাচ দিন অতিবাহিত হইল, কই। কিছুই ত অনুসন্ধান করিতে পারি-

পাম না। কেমন করিয়াই যে সন্ধান করিব, তাহারও ঠিক করিতে পারিতেছি না। তিনি চারি দিন ত অনাহার, এখন কোথায় যাই কোথায় যাইলে একটু আশ্রয় পাই, এই ভাবিয়া আকুলিতা হইলেন। লাবণ্যময়ি! সাবধান, স্বর্গীয় প্রেম-নদীর তীরে আসিয়া ফিরিও না। অনঙ্গপালের প্রেমের কথাও স্মরণ রাখিও, অত্যন্ত কষ্টের সময় অনঙ্গের প্রেরিত পত্রখানি পড়িও, সকল দুঃখের লাঘব হইবে। পাঠক মহাশয়! ভাগ্যচক্রের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখুন, লাবণ্যময়ী এই দুঃখস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনঙ্গপালের প্রগাঢ় প্রণয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এত দুঃখ, এত কষ্ট,—এত মর্ম্মবেদনায়ও লাবণ্যময়ী দিশাহারা হন নাই। বীর-রমণী, বীর-পত্নীর ন্যায় অটল, অচল। যদি কেহ সুখের প্রত্যাশী হইতে চাও, যদি কেহ সুখের নির্ম্মল স্রোতে অঙ্গ ঢালিতে বাসনা কর, বিপদে অধৈর্য্য হইও না! যতই দুঃখের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তোমাতে ঘাত প্রতিঘাত হউক না কেন, ধৈর্য্যধারণ করিবে, ধৈর্য্যবলে বলীয়ান হইবে। বশিষ্ঠদেব যখন কামধেনু হরণের সময় আপন ব্রহ্মদণ্ড সাহায্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অগণ্য সৈন্য নাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৈর্য্যদণ্ডের সাহায্যে এককালে সমস্ত আপদ বিপদ নষ্ট হইবে। বেলা হইল, পথে লোকজন চলিতে আরম্ভ করিল, লাবণ্যময়ী আর তথায় বিলম্ব না করিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

যুদ্ধ-সজ্জা।

অনঙ্গপাল লাবণ্যময়ীর পত্র পাঠ করিয়া সমস্ত অবগত হই-য়াছিলেন। মহম্মদ গজনবী সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, ক্ষত্রিয় কেমন করিয়া ধর্ম্মের হানিকর দেবতার উপর উপদ্রব সহ্য করিবেন। রাজা জীবিত থাকিতে প্রজার হাহাকার শুনিবেন, রাজা জীবিত থাকিতে অপবিত্র-যবনগণ কর্ত্তৃক তাহাদের ধর্ম্ম লোপ হইবে—ইহা তিনি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন,—কখনই নয়; বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা জয়পালের বীর পুত্র জীবিত থাকিতে তাহা কখনই হইবে না। সুস্থ নীরোগ শরীর অনঙ্গপাল জীবিত থাকিতে যবনগণের আশা কখনই সফল হইবে না। অনঙ্গপাল নিজ সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া সকলকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে অনুমতি দিলেন। রাজার অনুমতি পাইয়া সৈন্যগণ বীরবেশে সুসজ্জীভূত হইয়া সম্মুখস্থিত ময়দানে দণ্ডায়মান হইল। পরে অনঙ্গপাল আপনি যোদ্ধৃবেশ পরিধানপূর্ব্বক সেনাগণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নিম্নলিখিত উৎসাহ বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন,—

১

বঙ্গবাসী চিরকাল স্বাধীনতা ধন,
রেখেছিল যতনে, এবে কিন্তু তাহা,—

অপহৃত হইয়াছে এ দেশ হইতে ;
কে যে লইয়াছে তাহা না পাই দেখিতে।

২

কেমনে পাইব, কেমনে ধরিব চোর,
যে চোরে হরেছে চির স্বাধীনতা ধন,—
প্রলোভনে ভুলি মোরা আপনার দোষে,—
তুলিয়া দিয়াছি তাহা শত্রুর গরাসে

৩

দেশ দেশান্তর হতে যত রাজাগণ,
সময়ে সময়ে বঙ্গে করিয়া প্রবেশ,
ভুলাইল আমাদের মোহিনী মায়ায়,—
মহামূল্য ধন সব দেশে লয়ে যায়।

৪

নইলে কি এ দেশের লোক সমুদয় !
উদরের তরে এবে দাসত্ব করিত ?
অধীনতা যদবধি করেছে প্রবেশ,—
তদবধি বঙ্গদেশে নাহি সুখ লেশ।

৫

স্বাধীনতা কি যে সুখ, পাখীরাও জানে,
কেমন স্বাধীনভাবে কানন মাঝারে,
আনন্দে আলাপ করে মধুময় গান,
শুনিলে উদাস হয়ে শোকাতুর প্রাণ।

৬

সময়ের গুণে আর বিধির বিপাকে,
নির্ম্মম কিরাত কভু সুবিস্তৃত জালে
হত যদি করে সেই বিহঙ্গমগণে,—
তবে সে সঙ্গীত ভাল লাগে না শ্রবণে;

৭

সুদৃঢ় শিকল পদে পসিয়া পিঞ্জরে,
সদানন্দে যাপে দিন পরাধীন ভাবে;
হায় বঙ্গবাসি! এবে তোমরা সকলে,
পাখীদের মত দিন যাপিছ বিফলে!

৮

দুরন্ত যবনগণ মোহ ফাঁদ পাতি,
ভুলাইতে চেষ্টা সবে করিছে এখন;
বাঙ্গালী বিহঙ্গ তাই পড়িয়া তাহায়,—
স্বাধীনতা গীত তারা আর নাহি গায়।

৯

দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ করি পদদ্বয়,
আনন্দে অবনীমাঝে করে বিচরণ;
ভাবেনা বারেক কি যে স্বাধীনতা ধন,—
মোহে পড়ি ভুলিয়াছে আপনি আপন।

১০

কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করে পাখীগণ,
কাটিতে পিঞ্জর আর লোহার শিকল,

কোনরূপে পলায়ন করিতে পারিলে,
পূর্ব্বকার মত থাকে স্বচেষ্টার ফলে।

১১

ছি ছি রে অধম জাতি বঙ্গবাসিগণ!
এ হেন নিশ্চেষ্ট ভাবে রবে কতকাল?
যবন তোদের দেশে করিয়া প্রবেশ—
দেখিছ না সর্ব্বনাশ করিছে অশেষ।

১২

দেখ রে পামরগণ মন্দিরেতে পশি,
চূর্ণিত করিছে ওই আরাধ্য মূরতি,
আর কি নীরবে থাকা উচিত এক্ষণে?
চক্ষে এ অত্যাচার সহিবে কেমনে?

১৩

অতএব ভ্রাতাগণ! চেষ্টা একবার,—
করি এস সবে মিলে স্বাধীনতা তরে;
চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাহি রে সংসারে,
অসাধ্য সাধন হয় চেষ্টা হ'লে পরে।

১৪

সচেষ্টা বলেতে সবে হয়ে বলীয়ান,
কাড়িলও নিজেদের অমূল্য রতন;
স্বাধীনতা ধনে মোরা হয়ে ধনবান;
গাহিব সকলে পুনঃ বঙ্গের কল্যাণ।

ভাই বঙ্গবাসি! উৎসাহিত হইলে কি? অনঙ্গপালের উৎ-
সাহবাক্যে তোমাদের নিরুৎসাহিত হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণ হইল

কি? হৃদয়-কন্দর পুনরায় সাহস তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া রণ-রঙ্গে নৃত্য করিতেছে কি? হায়! কোথায় কি, কে কার কথা শুনে? চির-পরাধীনতা-লোলুপ বঙ্গবাসীর ভগ্ন-হৃদয় কি উৎসাহিত হইবার, তাই উৎসাহিত হইবে! এ গোলামের জাতি কেবল গোলামীই শিখিয়াছে, আজীবন গোলামীই করিবে। উৎসাহ, তেজ, ক্ষমতা, বিচারশক্তি বিজাতীয় যবনের পদে বিক্রীত করিয়া কেবল বিলাসিতাই শিখিতেছে। বিলাসিতাই তাহাদের প্রাণের জিনিস—ইহা কি তাহারা ছাড়িতে পারে। এতদিন গোলামী করিয়া যাহা অভ্যাস করিয়াছে, অনঙ্গপালের এক দিনের উৎসাহ বাক্যে তাহা কেমন করিয়া ভুলে—এ ভুলা কি বড় সহজ কথা—ইহা ভুলিবার নয়।

যত বল, যত কও, হতচৈতন্য বাঙ্গালীর চৈতন্য হইবার নয়, বাক্পটু বাঙ্গালী হৃদয় অসার, কেবল বচনই সার, বাহ্যাড়ম্বরই অধিক। নির্জ্জীব বাঙ্গালি! আর তোমাদের উন্নতির আশা কোথায়?

অনঙ্গপাল কর্ত্তব্যকার্য্য পালন করিলেন, সৈন্যগণকে নানাবিধ উৎসাহিত বাক্যে সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ উৎসাহিত হইল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে, কি করিবে, তাহা কে বলিতে পারে! অনঙ্গপাল সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, সেনাপতি রণোন্মত্ত সৈন্যগণকে লইয়া সোমনাথের মন্দিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

অনঙ্গপাল মাতুলমহাশয়ের অনুমতি ও তাঁহার পদধূলি লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"নানা কথা।"

বৈশাখ মাস, বেলা প্রায় আটটা বাজিয়াছে। সকলে স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে। লাবণ্যময়ী সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলায় শয়ন করিয়াছিলেন। এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। লাবণ্যময়ীর সে মাধুর্য্যময় শরীরকান্তি অনাহারে অনিদ্রায় বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, এখন তাঁহাকে কেহ দেখিলে সে লাবণ্যময়ী বলিয়া চিনিতে পারিবেন না আহার, নিদ্রা, ভোগ, বিলাসই মানব দেহের স্ফূর্ত্তি, ইহাতেই মানবদেহ কান্তিবিশিষ্ট হয়, তাহার বিহনে দেহের শোভা থাকে না, ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া যায়। এক দিনের উপবাসে লোকের কত কষ্ট হয়, লাবণ্যময়ী উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন কিছুই আহার করেন নাই, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, আহার আর না করিলে চলে না।

পাছে কেহ তাঁহার স্বকার্য্য সাধনে বাধা দেয়, কেহ যদি তাঁহার সতীত্ব-মধু হরণ করিয়া কলঙ্কিনী করে, এই ভয়ে তিনি কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করেন নাই, গ্রামের ভিতরও প্রবেশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এমন করিয়া কদিন চলিবে, আহার না করিলে যে শরীর রক্ষা হইবে না, শরীর রক্ষা না হইলে স্বকার্য্য সাধন হইবে কিসে, কেমন করিয়া তাঁহার প্রাণের প্রাণ অনঙ্গপালের নিকট যাইবেন। এইরূপ চিন্তা

কহিতে কহিতে লাবণ্যময়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের ভিতর যাওয়াই স্থির করিয়া একমনে গমন করিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়,—ক্ষুধা তৃষ্ণায় মুখপদ্ম শুষ্ক হইতে লাগিল, অনর্গল স্বেদ নির্গত হইয়া পরিধেয় বসনসকল আর্দ্র হইতে লাগিল; নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। হায়! অতুল ধনের অধিশ্বরী আজ পথের ভিখারিণী,অনাথিনী! পাঠক! এখন হইতে আমরা লাবণ্যময়ীকে অনাথিনী বলিয়া সম্বোধন করিব। একে যুবতী,—মন দুঃখে কাতরা, তাহাতে আবার আহার নিদ্রা তিরোহিত,—পথকষ্ট; অন্তর আবার প্রিয় বস্তুর অদর্শনে চঞ্চল, সুতরাং পাগলিনীর ন্যায় নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অপরিচিতা একটী রমণীকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা দেখিয়া,গৃহস্বামী শশব্যস্তে নিকটে আসিলেন। অনাথিনী গৃহস্বামীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ গৃহস্বামী অনাথিনীকে চিনিতে পারিল না,লাবণ্যময়ীর এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পাঠক! আপনারা কি এই বৃদ্ধকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইনিই আমাদের বৃদ্ধ তারাচাঁদ, সেনাপতি বিক্রমকেশরী রাগান্বিত হইয়া,তাহাকে অতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন। তারাচাঁদ বৃদ্ধ ও ধার্ম্মিক, লাবণ্যময়ীকে সে আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিত,সেনাপতির ক্রুরাচরণে ও লাবণ্যময়ীর নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল। এ পাপ সংসারে থাকিলে পরিণামে বিনাদোষে নানা অপমান সহ্য করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া, তারাচাঁদ নিজেই কাষ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আপনার গৃহে আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন ঈশ্বরারাধনায় কাটাইতেন। রাজ সরকারে

চাকর সকলে প্রায়ই বড়লোক হইয়া থাকে, কিন্তু তারাচাঁদ তাহা হয় নাই, ধার্ম্মিক বলিয়া তিনি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। আর তাহার অর্থের আবশ্যক ছিল না, কারণ তিনি একাকী, সংসারে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। কেবল এক জন প্রতিবাসিনী, তিনি আপনার জননীর ন্যায় তাহাকে ভক্তি করিতেন। ঐ প্রতিবাসিনীই তাহার সংসারে সহায়।

গৃহস্বামী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কে গা? কি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছ এবং কোথায় যাইবে, প্রকাশ করিয়া বল, নতুবা আমি সাতিশয় দুঃখিত হইব; আর অদ্যকার মত এইখানে অবস্থিতি কর কাল সকালে তোমার যথা ইচ্ছা গমন করিও। এখন বাটীর ভিতর গিয়া যাহা পান ও ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়—অনায়াসেই প্রাপ্ত হইবে, কিছুরই ত্রুটি হইবে না। অনাথিনী গৃহস্বামীর অমায়িকতা ও দয়ার্দ্র চিত্ত দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন ও মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে ইঁহার নিকট মিথ্যা কথা বলা হইবে না। তাহা হইলে আমার পাপ হইবে, আমি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইব, পরন্তু অন্তকালে আমাকে নরকে গমন করিতে হইবে। আর যদি সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলি, তাহা হইলে আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, তবে এই স্থানে এই, রূপ প্রকাশ করা উচিত যে, আমি স্বকার্য্য সাধন করিয়া যদি পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে আপনার নিকট সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বলিব। এই স্থির করিয়া বলিলেন—"পিতঃ! আপনি আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিতে অক্ষম, কারণ আমার মনের

ভাব প্রকাশ করিলে, আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব। আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। আমি প্রত্যাগমন কালীন আপনার নিকট প্রকাশ করিব।" গৃহস্বামী অনাথিনীর মনোভাবের কথঞ্চিৎ আভাষ পাইয়া বলিলেন—"মা! তুমি রমণী, সঙ্গে কেহ নাই, এই নির্জ্জন বন প্রদেশে কিরূপে একাকিনী গমন করিবে। এই বন্যজন্তু সমাকীর্ণ পথিমধ্যে কত ভয়াবহ ঘটনা ঘটিতে পারে, তুমি এসকল অতিক্রম করিয়া কিরূপ প্রকারে যে স্বকার্য্য সাধন করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাই হউক, বৎসে! এক্ষণে বাটীর ভিতর গমন পূর্ব্বক পান ভোজন করিয়া সুস্থ হওগে।" অনাথিনী গৃহস্বামীর আতিথ্য সৎকারে পরম পরিতৃপ্তা হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সম্মুখে একটী মনোহর সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। সরোবরের চতুষ্পার্শ্ব নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে পরিশোভিত। সরসী সলিলে অগণ্য নলিনী প্রস্ফুটিত হইয়া নলিনীনাথের প্রণয় ভিক্ষা করিতেছে। লম্পট ভ্রমরকুল অবলা গণকে অনাথা দেখিয়া গুন্ গুন্ স্বরে তাহাদের হৃদয়মধু অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন স্থানে ময়ূর ময়ূরী কেকারবে প্রেমামোদে ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে নবীন পল্লব পরিশোভিত পাদপ সকল বায়ুভয়ে শন শন শব্দ করিয়া আন্দোলিত হইতেছে। কুলমহিলাগণ সারি সারি অলঙ্কারের ঝনৎকার শব্দ করতঃ মরালগমনে বারি তুলিতেছে; অনাথিনী দেখিয়া শোকে অধীরা হইলেন, পরিশেষে আত্মশোক সম্বরণ করিয়া একটী সমবয়স্কা কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগ্নি! সরোবর সহ এই উদ্যানটী কাহার? আর এই উদ্যানের পূর্ব্বসীমাস্থিত

মন্দির মধ্যে যে দেবী প্রতিমা বিরাজ করিতেছেন, উঁহার পূজাই বা করে কে?"

রমণীগণ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একটী সমবয়স্কা স্ত্রীলোক বিনীতভাবে ডাকিতেছে; চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— "কে তুমি! কাহার ঘরণী? কোথা হইতে আসিতেছ, শীঘ্র শীঘ্র বল? নতুবা আমরা মহারাণীর নিকট জানাইলে তোমার নিস্তার নাই। আর এই সরোবর সহ উদ্যানটী মহারাণীর অধিকৃত; ইহা পুরুষের অগম্য স্থান; রমণী ব্যতীত পুরুষ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। আর ঐ মন্দিরমধ্যে যে কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ উহা মহারাণী স্থাপিত, একজন সিদ্ধ ব্রাহ্মণী দেবীপূজার জন্য সর্ব্বদা নিয়োজিত আছেন।" অনাথিনী রমণী-গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"ভগ্নি! আমি, অনাথিনী, তোমরা আমার ভগ্নির স্বরূপ, আমার প্রতি রাগ করিও না। আমি সত্বরই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমরা যেন আমার আগমন বৃত্তান্ত তোমাদের মহারাণীর নিকট বলিও না, এই আমার অনুরোধ।" পাঠক মহাশয়গণ! আপনারা জানেন, স্ত্রীজাতির উদর সর্ব্বাপেক্ষা অপরিপক্ক, একটা কথাও জীর্ণ হয় না। গোপনীয় কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না, শুনিলেই অন্তরে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। যতক্ষণ তাহা না প্রকাশ করে, যতক্ষণ পল্লীময় রাষ্ট্র না হয়, ততক্ষণ নিস্তার নাই, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এইরূপ। অনাথিনী যে এত অনুনয় বিনয় করিয়া, কথাটী গোপন করিতে বলিলেন, সে বিষয় তাহাদের কর্ণেও প্রবিষ্ট হয় নাই। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" কেবল আপনার কথা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত।

প্রথম নারী। হ্যাঁ দিদি! ও মেয়েটা কে ভাই? একলা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে।

দ্বিতীয় নারী। ওলো! আমার বোধ হয়, কোন গৃহস্থের বউ বেরিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় নারী। ওলো নির্ব্বুদ্ধিনি! তা নয় লো, তা নয়, বেরিয়ে গেলে বুঝি বনে বনে অমন করে ঘুরে বেড়ায়? তোর তো বুদ্ধি খুব।

চতুর্থ নারী। তোরা সকলে যা বলাবলি কচ্ছিস্ ভাই। তার কিছুই নয়, ওর মনে অন্য কিছু ভাব আছে।

পঞ্চম নারী। মনে আর ছাই আছে,—বারফট্‌কা মেয়ের ধরণই ঐ, বন দিয়ে বন দিয়ে, শেষে নগরে গিয়া নাগর অন্বেষণ করে।

দ্বিতীয় নারী। ওলো মিতিন্! ওসব হতচ্ছাড়ীদের বিশ্বাস নাই,ওরা সব কর্ত্তে পারে,পতনে পেলে গলায় ছুরি পর্য্যন্ত দিতে ভয় করে না। চললো, এখন আমরা রাণীমাকে এ সব কথা বলিগে।

প্রথম নারী। তোরা তো খুব গুলতোন করিস্। এ দিকে যে সরে গেল, তার উপায় কি?

দ্বিতীয় নারী। হাঁ ভাই! ঠিক বলেছিস্. দেখি কোন দিকে পালালো।

অনন্তর অনাথিনী রমণীগণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া গহনকাননাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, একস্থানে কতকগুলি দস্যু একটা শবদেহ লইয়া বিবন্ন শায়ী করিতেছে। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে এই নির্জ্জন বিপিন,

সঙ্গে কেহই নাই, অত্যন্ত ভীতা হইয়া, এক বৃক্ষপাশে লুকায়িতা হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। অনাথিনী বৃক্ষের পার্শ্ব হইতে ভয়চকিত চিত্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে দস্যুদিগের পৈশাচিক আচার ব্যবহার দেখিতে লাগিলেন। দস্যুদিগের মধ্যে কালীপূজা করিতেছে, কেহ বা জীয়ন্ত মনুষ্য সকলকে বৃক্ষমূলে আছাড়িয়া সংহার করিতেছে, কেহ কেহ অস্ত্র দ্বারা তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে। অনাথিনী গোপনভাবে এই সকল নরপিশাচদের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া থর থর কম্পিতা হইতে লাগিলেন, ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, পাছে তাহারা জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে, এই ভয়ে তথা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রস্থান করিতে লগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজ ভবনে।

ভব সংসারের নানা বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইল, অনাথিনী বসুন্ধরা মায়ের ক্রোড়ে নিদ্রিতা হইলেন। স দিনের রাত্রি অন্যান্য দিনের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত হইল। প্রত্যুষে অনাথিনী নগরমধ্যে উপস্থিত হওতঃ একটী পান্থশালায় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। তথায় ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া উঠিলেন—ধীরে ধীরে পর্ব্বতাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। একে কুলকামিনী, তাহাতে দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ দেখিয়া তাঁহার হস্ত পদ শিথিল ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। পর্ব্বতের উচ্চতা দেখিয়া নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, তথাপি অনাথিনী পশ্চাৎ পদ নহেন। স্বকার্য্য সাধনে বিরত না হইয়া পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনাথিনী! ধন্য অনুরাগ! ধন্য তোমার স্বকার্য্য সাধন ব্রত, শত ধন্যবাদ তোমার কষ্টসহিষ্ণুতার! উঠিতে উঠিতে অনাথিনী দেখিতে পাইলেন, পর্ব্বতের পাদমূলে একটী যোগী তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার চারিধারে অরণ্যবিহারী হিংস্র জন্তু সকল ভীষণ কলরব করিতেছে, তথাপি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। অনাথিনী আর সে দিকে গমন না করিয়া অন্যদিকে যাইতে লাগিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, গাঢ় অন্ধকারে দ্বন্দ্ব নিশীথ, তাহাতে আবার নির্জ্জন অরণ্য, জনমানবের সমাগম

নাই। সুতরাং আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়, পথ অনভিজ্ঞা অনাথিনী নিরুপায় দেখিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, ভগবানের নাম গান করিতে লাগিলেন ;—গীতটী এই :—

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

আর কে আছে আমার ;
হরি হে কে আছে আমার।
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে করিবে পার।
আমি ভবে একা, নাইকো বন্ধু সখা,
কেমনে তরিব আমি ভব পারাবার।
একে মাত্র তোমা ধনে, বঞ্চিত আমি সাধন বিনে,
তাইতে করি শঙ্কা মনে, কেমনে হইব নিস্তার।
অসাধনে জীর্ণ তরি, তাতে আবার পাপে ভারি,
পাপবারি পূর্ণ তরি, বাইতে নারি আর।
দ্বিজ যোগীনচন্দ্রে বলে, ওরে পাপী সাধন কলে,
তরে যাবি ভব জলে, উপায় কর সার।

অনাথিনী ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে বৃক্ষমূলে নিদ্রিতা হইলেন। নিদ্রাযোগে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া, তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যেন একজন দস্যু তাঁহার সতীত্ব হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। স্বদেশে যেন তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় রত্ন—যাঁহাকে এতদিন হৃদয়ের দেবতা বলিয়া হৃদি-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই প্রাণাধিক যেন যবনগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। স্বপ্নে এই সকল দর্শন করিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ—"হা দীনবন্ধু! হা অনাথ-শরণ বিধাতঃ! হা করুণাসাগর! এ অনাথিনী আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার অদৃষ্টে এত কষ্ট; এই যে এতক্ষণ কায়মনে আপনার নাম গান করিতেছিলাম। ঠাকুর! এই কি তাহার প্রতিফল! এই কি দয়াময়ের কর্ত্তব্য! দেব! জানি না, কি করিলে তোমার সৎবিধির অনুসন্ধান করা হয়।

হায় ভগবান্! যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, শোকের উপর শোক! আর রাত্রি নাই; যাই ঐ নদীতটে গিয়া উপবেশন করিগে। এইরূপ নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, নদীতীরে গিয়া এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন। প্রাতঃকাল হইয়াছে; পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেব লোহিতবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, পেশোয়ার রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন করিছেন। বৈশাখ মাস, দিবাকর মধ্যগগনে না আসিতে আসিতেই রৌদ্রের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আশাই জীবের জীবন! অনাথিনী ভাবিলেন; আর এরূপ ভাবে এখানে থাকা উচিত নয়, ঐ যে অট্টালিকা দেখিতেছি; বোধ হয়, কোন ধনবানের গৃহ হইবে, দেখি, যদি ঐ স্থানে আশ্রয় পাই। এই ভাবিতে ভাবিতে অনাথিনী ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের সম্মুখীন হইলেন এবং বিনয়বাক্যে প্রহরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাছা! আমি অনাথিনী; দুই তিন দিবস উপবাসী আছি, আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ পর্য্যন্তও বিগলিত হয়। বাবা! তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা এইযে, তোমরা দয়া করিয়া তোমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে আমার দুঃখ কাহিনী জানাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। স্ত্রীলোক দয়ার আধার, তিনি শুনিলে অবশ্য আমাকে আশ্রয় দিবেন।

পাঠক! আপনারা জানেন, যৌবনকাল অতি ভীষণকাল, এ সময় দেহ সতেজ থাকায় কাহারও প্রায় ধর্ম্মের পথে মতি হয় না রক্তের তেজে সকলেই ধরাকে সরার ন্যায় দেখে, দয়া ধর্ম্ম তাহাদের তেজোয়ান্ হৃদয়ে স্থান পায় না, এ সকল এই পাপময় কলিকালের কথা। কিন্তু কেহই ভাবেনা যে, এ গর্ব্ব, এ তেজ আর কত দিন! দর্পহরণের দিন যে নিকটবর্ত্তী, তখন যে ধর্ম্ম ভিন্ন উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই।

প্রথম প্রহরী একজন হিন্দুস্থানী যুবক; দয়া মায়া ইহার কঠিন হৃদয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পায়, এক কথায় বলিতে গেলে ইহার হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই, অনাথিনীর কাতর বাক্যে সদয় না হইয়া বরং কর্কশস্বরে বলিলেন—"নেই নেই, আবি নেহি হোগা, ভাগো হিঁয়াসে"।

দ্বিতীয় প্রহরী প্রথম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়সে প্রবীণ, অনাথিনীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল, সে নিকটে গমন করিয়া বলিল—"এ মায়ি! তুম্ কা দরকারত বা?" হায়! যিনি চিরকাল দাস দাসীর উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন, যিনি কুল-মহিলা, এই অপরিচিত স্থানে তাঁহার অপমানের একশেষ। অনাহারক্লিষ্টা অনাথিনী দ্বারবানের কথা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হইলেন।" "বড় বাড়ীর বড় কথা" গৃহস্বামী দয়াবান্ হইতে পারেন, পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু তমোগুণময় পাষাণহৃদয় দ্বারবান কিম্বা মোসাহেবদিগের জন্য সে দয়া কার্য্যে পরিণত হয় না। বড় বেলা হইতে লাগিল, অনাথিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল হইতে লাগিল, কখন উপবিষ্টা, কখন ভূমিষ্ঠা, কখন দণ্ডায়-

মানা হইতেছেন। এই সকল দেখিয়া দয়াবান্ দ্বিতীয়-প্রহরী বলিল,—"বহুত আচ্ছা! তোম্ খাড়া রহো, হাম রাণী-মাকো পাশ যাতা হ্যায়।

দ্বিতীয় প্রহরী চলিয়া গেল এবং মহারাণীর নিকট অনাথিনীর সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারিয়া বলিল,—"মা জি! দরজা মে একঠো রেণ্ডি খাড়া হোকে বহুত বাত কহনে লাগা আউর শির্‌পর্ হাত দেকে (বহুত) রোতা হ্যায়। রাণী মা! হাম্‌তো উস্কা বাৎ কুচ সম্‌ঝাতা নেহি, আপ্‌কা হুকুম হোয়ত উস্কো আনে বোলে।"

মহারাণী নিজ পরিচারিকার নিকট পূর্ব্বেই অনাথিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলে! পুনরায় প্রহরীর মুখে তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া, অনাথিনীকে লইয়া আসিবার অনুমতি দিলেন।

প্রহরী হুকুম পাইয়া অনাথিনীকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার আদেশ প্রদান করিল। অনাথিনী আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং মহারাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাতর বাক্যে বলিলেন,—"রাণী-মা! আমি দীনহীনা অনাথিনী, এ সংসারে আমার আপনার বলিতে আর কেহই নাই। আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমার প্রাণ যায়।

রাণী অনাথিনীর মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মা! দেখিতেছি, তুমি অবলা, কুলকামিনী, একাকিনী এত অল্পবয়সে এ কঠিন ব্রতে ব্রতী হইয়াছ কেন মা? এত কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছ কেন? এমন সোণার রং, এমন মধুর যৌবন, কেন বৃথায় হারাইতে অগ্রসর হইয়াছ। বনের

ফুল বনে ফুটে, বনেই শুখাইয়া যায়। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে এখানে কিছুদিন অবস্থান কর। অদ্য সন্ধ্যার সময় মহারাজ যুদ্ধে যাইবেন, এখানে পরপুরুষের আর সমাগম থাকিবে না। যতদিন তিনি পুনরায় ফিরিয়া না আসেন ততদিন তুমি আমার সহিত অবস্থান কর, এখানে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।"

অনাথিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যুদ্ধ হইতেছে।"

রাণী বলিলেন—"কেন, তুমি কি জান না, দুরাত্মা মহম্মদ গজনবী সোমনাথের পবিত্র মন্দির লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কুমার অনঙ্গপাল অগ্রসর হইয়াছেন। মহারাজ অদ্য তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।"

অনাথিনী—অনঙ্গপালের নাম শুনিয়া পরম পুলকিত হইয়া বলিলেন—"কত দিনে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে?"

রাণী বলিলেন—"পরশ্ব তারিখে?"

অনাথিনী মহারাণীর কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—মহারাজ কি একাকী যুদ্ধযাত্রা করিবেন? না তাঁহার সহিত আরও লোক জন যাইবে?"

মহারাণী বলিলেন,—"না তিনি একাকী যাইবেন না, সৈন্য সামন্ত তাঁহার সহিত যাইবে, তুমি এখন স্নানাহার কর, পরে সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে।" অনাথিনীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিল, দিনকতক বিশ্রাম না করিলে দেহের অনিষ্ট হইবে, আরও এখানে কিয়দ্দিন অবস্থান করিলে তাঁহার প্রাণের অনঙ্গপালের সংবাদ পাইবেন, এই ভাবিয়া রাণীর কথায় দ্বিরুক্তি

না করিয়া বলিলেন—"মা! আপনার কথা অবহেলা করা আমার সাধ্য নয়। তবে মা! আমার একটী অনুরোধ এই যে, আমি যথায় থাকিব, তথায় আর কেহ থাকিতে পারিবে না। আমি জন্মাবধি কখন পরপুরুষের সহিত অবস্থান করি নাই, এবং আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যতদিন আমার অভিষ্ট পুরণ না হইবে যতদিন আমার ব্রত উদ্যাপন না হইবে ততদিন আমি কাহারও নিকট আত্ম প্রকাশ করিব না। তাহার নিমিত্ত যেন আমায় কেহ বিরক্ত না করেন।" রাণী অনাথিনীর কথা শুনিয়া বলিলেন—"মা! তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি সদা সর্ব্বদা আমার সহিত থাকিও।এই বলিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল, মহারাজ প্রাতঃকাল হইতে কোথায় গিয়াছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে আসিয়া রাণীকে আহ্বান করিলেন। মহারাজার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাণী অনাথিনীর সহিত রাজার নিকটে আসিলেন। অনাথিনী রাজাকে দেখিয়া চমকিত হইলেন, একি! আমি কোথা আসিয়াছি! পাঠক! চিনিলেন কি? ইনিই পেশোয়ারের রাণা জীবনকিশোর বোধ হয়, আপনাদের স্মরণ আছে, ইহার সহিত অনাথিনী লাবণ্যময়ীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল।

মহারাজা শশব্যস্তে বলিলেন,—"সরোজ! আর বিলম্ব করিতে পারি না, সমস্তই প্রস্তুত; এখন তোমার অনুমতি হইলে হয়।"

মহারাণী সরোজিনী লজ্জায় নতমুখী হইয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন—"নাথ! দাসী আর কি বলিবে, সদা সাবধানে থাকিবেন, আর আমি কি বলিব"। জীবনকিশোর রাণীরনিকট হইতে বিদায় হইয়া গুজরাটাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

শিক্ষিত পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে সকলেই অবগত আছেন ১০২৬।২৭ সালে দুরাত্মা মহম্মদ গজনবী গুজরাটের অন্তর্গত সুবিখ্যাত সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন, এই সূত্রে ক্ষত্রিয়গণের সহিত তিন দিবস যুদ্ধ হয়। প্রথম দিবস অনঙ্গপাল সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন, প্রাণপণে সোমনাথদেবের বিগ্রহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। প্রথম দিবস জয় পরাজয়ের কিছুই জানিতে পারা গেল না। দ্বিতীয় দিবস জীবনকিশোর আসিয়া সসৈন্যে অনঙ্গপালের সহিত মিলিত হইলেন। পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল, অনঙ্গপাল ও জীবনকিশোরের রণকৌশলে যবন সেনাগণ অস্থির হইল, সকলেই জানিতে পারিল, এ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণের নিশ্চয়ই জয় হইবে। এখন অদৃষ্ট প্রতিকূলাচরণ না করিলে ক্ষত্রিয়ের জয় সুনিশ্চয়। ক্ষত্রিয়গণের রণপাণ্ডিত্যে মুসলমান সৈন্যগণ একে একে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণের আহ্লাদের সীমা পরিসীমা নাই। সকলে মহোৎসাহে রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল।

মহম্মদ গজনবী আপন সৈন্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া যাহার পর নাই ভাবিত হইলেন, কিসে এ ক্ষেত্রে তাঁহার মান রক্ষা হইবে, কিসে যুদ্ধ জয়ী হইবেন, এই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

নিজে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অদ্য কোন প্রকারে আর যুদ্ধ হইতে পারে না, যুদ্ধ করিতে গেলে হয়ত পরাজিত হইতে হইবে এই ভাবিয়া তিনি বিশ্রামসূচক তূর্য্যধ্বনি করিলেন। অদ্যকার মত যুদ্ধ স্থগিত হইল, সূর্য্যদেব সমস্ত দিন নরহত্যা স্বচক্ষে দেখিয়া আর দেখিতে পারিলেন না, দুঃখিত অন্তঃকরণে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। শকুনি গৃধিনীকুল সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া শবদেহের উপর একবার প্রাণ ভরিয়া আপনাদের প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। শৃগালকুল সন্ধ্যা আগত দেখিয়া বিকট চিৎকার করতঃ দলে দলে সমরক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। শৃগালগণের ঘোর কোলাহল ও আহত ব্যক্তিগণের কাতর চিৎ-কারে রণপ্রাঙ্গণ এক ভীষণ ভাব ধারণ করিল। একে ঘোর তামিনী রজনী, তাহাতে আবার চারিদিকে সমরানল প্রজ্বলিত। কাহার সাধ্য এই ভয়ানক সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হয়। পাঠক! ঐ দেখুন, একজন সৈনিক পুরুষ এই ঘোরা যামিনী-কালে জীবনের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে কোথায় চলিয়াছেন। মন সদাই চঞ্চল। যেন কোন হৃত বস্তুর অন্বেষণে কিম্বা কোন অসমসাহসিক কার্য্যসিদ্ধি করিবার মানসে কি জানি কোথায় চলিয়াছেন। সঙ্গে আরো দুই চারিজন অনুচর। তাহারাও ম্লানমুখে পূর্ব্বোক্ত সৈনিক পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।

এদিকে রাত্র অধিক হইল, অনঙ্গপাল অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও রণচণ্ডীর পূজায় উপবিষ্ট হইলেন। কায়মনে দেবীর পূজা সমাপ্ত করিয়া জীবনকিশোরের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। কিন্তু হায়! পরামর্শ করিলে কি হইবে, অদৃষ্ট যাহা

আছে, তাহা কোনক্রমেই লঙ্ঘন হইবে না। যতই পরামর্শ, যতই কৌশল কর না কেন, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, উষা সতী মলিন বসন পরিধান, করিয়া ধরামাঝে অবতীর্ণ হইলেন, আর রাত্রি নাই দেখিয়া অনঙ্গপাল সসৈন্যে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া সমর ক্ষেত্রাভি-মুখে ধাবিত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সকল সহ্য করিতে পারে, ধর্ম্মের অবমাননা কিন্তু প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারে না। পাপাত্মা মহম্মদ তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, পবিত্র সোমনাথের মন্দির ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে? ধর্ম্মই হিন্দুর মান,ধর্ম্মই হিন্দুর প্রাণ,ধর্ম্মই হিন্দুর ইহ পরকালের সম্বল। এমন অমূল্য নিধি কি হিন্দু অকাতরে অস্পর্শীয় যবনকরে সমর্পণ করিতে পারে?—না কখনই না, যতদিন হিন্দু নাম জগতে থাকিবে,যতদিন ক্ষত্রিয় শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত প্রবাহিত থাকিবে ততদিন কখনই এ মর্ম্মবিদ্ধ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে না। অনঙ্গপাল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহম্মদ গজনবী পূর্ব্বদিন অপেক্ষা চতুর্গুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সোমনাথের মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইতে। যবনগণের এই সকল কৌশল দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি অধীর হইলে সৈন্যগণ আর কাহার উৎসাহে উৎসাহিত হইবে,কে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবে,বিপদের সময় অধীর হওয়া ক্ষত্রিয়বীরের উচিত নয়। এই ভাবিয়া তিনি আপনার সৈন্যগণকে নিম্নলিখিত প্রকারে সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন—

হের, দেখ ভাইসব!

দুরন্ত যবন আজি নিজ ভুজবলে,
পশিয়া মায়ের বক্ষে করি পদাঘাত,
প্রতিজ্ঞা করেছে মনে নাশিতে সমূলে
হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম! যে ধর্ম্মের তরে
ধন্য মোরা! ধন্য এই পুণ্যভূমি অবনী
মাঝারে! যাহাই হউক, কিন্তু ইহার
প্রতিকার তরে করেছি বিবিধ চেষ্টা
মোরা সবে মিলি,—কেঁদেছি ধরিয়া পদে
দুরাত্মাগণের, মিনতি করেছি কত
সকরুণ স্বরে,—ভিক্ষা দাও, ধর্ম্মে হাত
দিওনা মোদের! কিছুতেই কিছু কিন্তু
না দেখি উপায়, সংকল্প করেছি মনে;
আবাল বৃদ্ধ বনিতা একসূত্রে মিলে
উদ্ধারিব ধর্ম্মধন শত্রুহস্ত হতে।
একতা বলেতে মোরা ভারত মাঝারে
সাধিব যতেক কার্য্য কিবা ভয় আর।
সাহসীর পুত্র হয়ে ভীরু আচরণ
সাজে কি মোদের ভাই! ক্ষত্র বীর মোরা!
পবিত্র আর্য্যের সুত যবনের দাস
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমা সবাকারে,
আর্য্য কুলাঙ্গার মোরা এবে সুনিশ্চয়।
সাহসী আর্য্যের সুত হইয়া আমরা
সামান্য পশুর মত সভয়-হৃদয়?

আর না, সাহসে বাঁধিয়া হিয়া, নির্ভয়ে
সঘনে গাও ভারতের জয়! ভয় কি
কাহারে তাই আর্য্যবংশধরে? শৃগালে
কি করে ভয় সিংহের তনয়? সকলে
একত্রে মিলে পদাঘাতে চূর্ণ করি
যবনের শির; স্বদেশের হিত আশে
হয়ে একমন সাধিব দুষ্কর কার্য্য।
তাহলে যবনগণ ধর্ম্মে হাত কভু
আর দিবেনাকো আর; বরং পদানত
হয়ে সবে রবে আমিবার। স্বচেষ্টায়
ধর্ম্ম ধন পুনঃ পেয়ে মোরা সযতনে,—
রাখিব অমূল্য নিধি হৃদয় ভিতরে!
ভারত মাহাত্ম্য পুনঃ নবীভূত হয়ে
থাকিবেক চিরকাল অবনী মাঝারে।

ক্রমে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। মহম্মদ গজনবী দক্ষতার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। আজ আর কাহারও নিস্তার নাই। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যদ্রূপ মেষপালকে আক্রমণ করিয়া অবলীলাক্রমে বধ করে। সমরপিপাসু মহম্মদ তদ্রূপ ক্ষত্রিয় সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিল। রাজপুত সেনাগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু আজ মহম্মদের নিকট সকলই বৃথা, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। প্রজ্বলিত অনলে তুলারাশি যেমন ভস্মীভূত হয়, মহম্মদের ক্রোধানলে ক্ষত্রিয় সেনাগণ তদ্রূপ প্রাণ হারাইতে লাগিল। পরশেষে অনঙ্গপালের সেনাপতি হতাশ হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। অবশিষ্ট অনঙ্গপাল,

জীবনকিশোর ব্যতীত আর কেহই নাই। অনঙ্গপাল কিন্তু তুচ্ছ প্রাণের আশা করেন না, মান গেল ত প্রাণ লইয়া কি হইবে, এই ভাবিয়া তিনি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একাই এক সহস্র, কুমার অনঙ্গপালের রণ-কৌশলে মহম্মদ গজনবীর সৈন্যগণ থরহরি কম্পমান হইতে লাগিল। জীবনকিশোরও কোন অংশে ন্যূন নহেন, তবে অনঙ্গপালের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

মহম্মদ গজনবী অসহায় কুমার অনঙ্গপালের বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। ক্ষিপ্তপ্রায় অনঙ্গপাল ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে স্বীকৃত আছেন, তিনি জানেন, প্রাণ অপেক্ষা স্বাধীনতা মূল্যবান, প্রাণ হারাইলে কোনও কষ্টই হইবে না, সকল জ্বালা যন্ত্রণা এককালে নির্ব্বাণ হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা হারাইলে যে চিরকাল যবনের পদতলে আত্ম বিক্রয় করিতে হইবে, আজীবন সহস্র সহস্র বৃশ্চিকের দংশন যাতনা সহ্য করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা—পরাধীন জীবনভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্র গুণে প্রার্থনীয়। ক্ষত্রিয় বীর কি সহজে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। অনঙ্গপাল! ধন্য বীর, ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগে, ধন্য তোমার ধর্ম্মানুরাগে, শত ধন্য সাহসিক হৃদয়ে! কিন্তু দেখ! তোমার আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া লাবণ্যময়ী এখনও জীবিতা আছে; তোমার শারীরিক কোনও অশুভ সংবাদ শুনিলে, সে লাবণ্যলতা কখনই জীবিত থাকিবে না, সে যে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। কিন্তু হায়! জয় পরাজয় ত মানবের ইচ্ছাধীন নয়।

অনঙ্গপাল ও জীবনকিশোর যথার্থ ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় যুদ্ধ

করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অগণিত সৈন্যের মধ্যে তাঁহাদের বলবীর্য্য আর কতক্ষণ। ক্রমশঃ অস্ত্রাঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, দরদরিত ধারে রুধির পতিত হইয়া অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল, ক্রমে চেতনা বিলুপ্ত হইতে লাগিল। এই অবসরে দুই চারিজন যবন আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল, জীবনকিশোর নিকটে ছিলেন না। তাহারা অনায়াসেই অনঙ্গের হতচেতন পবিত্র দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে ফেলিয়া দিত। জীবনকিশোর অনঙ্গপালকে বন্দী হইতে দেখিয়া আপনি পলায়ন করিলেন। যবন সৈন্যগণ জীবনকিশোরকে আর তত লক্ষ্যনাকরিয়া সকলে অনঙ্গপালের দিকে ছুটিয়া আসিল। মহম্মদ গজনবী অনঙ্গপালকে ধৃত করিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলিলেন। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আপনি সোমনাথের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিগ্রহটিকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। সেই হিন্দুর আরাধ্য মূর্ত্তি চূর্ণিত করিয়া, মক্কা, মদিনা, গজনী প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করেন, এবং মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রজত প্রভৃতি রাশি রাশি দেব সম্পত্তি লাভ করিয়া বহু ক্লেশ ভোগের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। হায়! এতদিনের আশা ভরসা, এতদিনের স্বাধীনতা সমস্তই মুশলমানগণের পদতলে বিক্রীত হইল, এই সময় হইতে ভারতের দুর্দ্দশার সূত্রপাত, এই সময় হইতেই ভারতবাসীর অবনতির সূত্রপাত। এই সময় হইতেই ভারত মাতা তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের সহিত অধীনতা নিগড়ে আবদ্ধা হয়েন, অন্যান্য জাতির দুর্দ্দশা যত হউক আর নাই হউক হিন্দুজাতির দুর্দ্দশার একশেষ। যখন যে যে রাজা ভারতবর্ষ

আক্রমণ করিয়াছেন, সকল রাজা কর্ত্তৃকই
তেছে, এমন কষ্ট সহ্য করিতে, এমন অ
কোন জাতি নাই। ইহাদিগকে পা
নিস্পন্দ, ইহারা পরের পদধুলি মস্তকে
গ্রহণ করিয়াছে এবং যতদিন জীবিত
পদধুলি তাহাদের মস্তকের মণির ম
বঙ্গবাসি! সেই সর্ব্বতির আইন পাশে
স্মরণ আছে কি? তোমরাই নাকি অ
পরিচয় দাও, ছি—ছি।

—•—

শ পরিচ্ছেদ।

মন্দিরে।

কাহার সাড়া শব্দ নাই। দিবসের
হ, প্রকৃতি সতী ভীষণ ভাব ধারণ
কাশ করিতেছে। একে সম্মোহন
তান স্বর বিমিশ্রিত নিশাবিহঙ্গের
াকুতের ঝুরু-ঝুরু ধ্বনি; মধ্যে মধ্যে
ত সঙ্গীতের প্রাণারামকারী লহরী
পুরুষেরা মোহন গান করতঃ কুহক
য করিতেছেন। এ সময় সকলেই
ল ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়াছে। জগতে
কেবল অদূরবর্ত্তী দেবীমন্দিরের
কি ভাবিতেছেন। যুবতীর পূর্ণ
য়, যৌবন তরঙ্গে অঙ্গ ঢল ঢল;
সনে আচ্ছাদিত, মধুর অধরে কিন্তু
, আলুলায়িত কুন্তলজাল,—দুই
ই সুচারু বদনকমলের সৌন্দর্য্য
মরি! বিধিরে! এনিধি,—অমূল্য
কি দিয়া গড়িয়াছিলে, ধন্য দেব।
র! তোমার কারুকার্য্যময় রমণী
রর মধ্যে যদি কেহ ভাবুক থাক,

যদি তোমাদের মধ্যে কাহার হৃদয়ে পবিত্র প্রেম বদ্ধমূল হইয়া থাকে, ভাব দেখি একবার এই সৌন্দর্য্যের বিষয়, স্থির চিত্তে একবার চিন্তা কর দেখি, এই নিস্তব্ধ রজনী সময়ে, জ্যোৎস্না-কিরণে বিভাসিত এই বিষাদিত নারীমুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্যের বিষয় জানিতে পারিবে,—এ ধন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ইহার সহিত জগতের কোন বস্তুর তুলনা হয় না।

রমণীর ললাটপটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে, যেন স্বর্ণ ভূধরে রজতের ছটা; পরহিতকারী জগজ্জীবন যেন যুবতীর এ কষ্ট দেখিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া, ঘাম মুছাইয়া দিতেছে। পবনদেব তাঁহার হিতের জন্য শুশ্রূষায় নিযুক্ত, কিন্তু রমণীর তাহা সহ্য হইল না। মলয় সমীরণ গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র দেহ কণ্টকিত হইল, এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না; ধৈর্য্যের হাল ভাঙ্গিয়া গেল, হরিণ নয়নার হরিণ নেত্র চঞ্চল ভাব ধারণ করিল। পাঠক! বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না—এ রমণীকে? বিরহ বিধুরা অনাথিনী, প্রাণকান্তের বিহনে এই দশাগ্রস্তা, হায়! কোমল প্রাণে আর কত সহ্য করিবে। কোন্ রমণী এ পূর্ণ যৌবনকালে প্রিয় সমাগতে বঞ্চিত থাকিতে পারে, তায় আবার ইনি অনঙ্গপ্রাণা, বহু দিন তাঁহার কোন সুসংবাদ না পাইয়া মর্ম্মজ্বালায় অস্থিরা, কে তাঁহার প্রাণসম অনঙ্গের সন্ধান বলিয়া দিবে। অনাথিনী বিরহবাণে জর জর হইয়া. বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

দুরন্ত বসন্তে একে জর জর কায়,
ধৈরয ধরিতে নারি জ্বলে মম প্রাণ।
তাহে পুনঃ মদনের ভীষণ তাড়নে—

অস্থির হতেছি অতি ; দুর্ব্বল অবলা।
আমি সহিব কেমনে হেন অত্যাচার ?
এ ঘোর সঙ্কটে মোরে কে করিবে ত্রাণ—
একা আমি, প্রাণনাথ নাহি মোর কাছে।
অবলায় পেয়ে একা মন্মথ পামর.
ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে হানি ফুলবাণ।
আপন বলিতে কেহ নাহিক আমার
ধরা মাঝে, তাই বুঝি সঙ্কট সময়ে
অবলা বধিতে প্রাণে সকলের আশ ?
কুরুক্ষেত্র রণে যথা অভিমন্যু বীরে
পেয়ে একা, সপ্তরথী মিলে করেছিল,
ছিন্ন ভিন্ন কোমল শরীর শরজালে।
সেইরূপ নিরাশ্রয়া পেয়ে দেখ সবে,
দারুণ প্রহারে মোরে করিছে আহত।
কিন্তু যদি পিতা তার পার্থ মহাবীর
থাকিত নিকটে ; কার সাধ্য বধে তারে ?
তেমতি যদিরে দুষ্ট কাম সেনাগণ !
থাকিত নিকটে মোর ধব প্রাণধন,—
তবে কি জ্বালাতে তোরা পারিস্ আমারে।
ক্ষান্ত হয়ে, ক্ষান্ত হয়ে বধোনা আমারে
নিষ্ঠুর প্রহারে ! আমিযে অবলা নারী,
মহারথী প্রথা নহে বধিতে আমায়।
শুনিলে না, মম এই কাতর ক্রন্দন,
দ্রবিতে নারিল্প তোর কঠিন হৃদয় ?

অবশ হইল অঙ্গ গেল বুঝি প্রাণ,
গেল বুঝি চিরতরে সতীত্ব ধরম
কলঙ্কিনী করে মোরে হেন অসময়ে।
যা-যা প্রাণ, যা-যা মান যাওরে সকলে
কি কাজ রাখিয়ে আর তোদের আমায়;
সতী-নারী-মুখোজ্জল সতীত্ব রতন
যদি না রহিল মোর, বিদায়িনু সবে
যা চলি সকলে মিলে যথা ইচ্ছা হয়
কলঙ্কিত কেন হবি থাকিয়ে হেথায়।

অনাথিনী এইরূপ প্রকারে বিলাপ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সোনার কমল ভূমিতলে ফুটিলে যাদৃশ শোভা হয়, অথবা স্নিগ্ধজ্যোতি-চন্দ্রমা গগনচ্যুত হইয়া যেমন শোভা বিস্তার করে, রমণী তদ্রূপ ধরাপরি বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। হা দয়া ময় বিধি! এ তোমার কি বিচার, দয়াময় নাম ধারণ করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় কেন এমন আচরণ করিলে। ঠাকুর! সুকোমল পুষ্পে কেন কীটের আবাসভূমি করিয়াছিলে, প্রেমিক হৃদয় জ্বালাতন করিবার জন্য কেন বিরহ বাণ সৃজন করিয়াছিলে? দেখ দেব! তোমার সোহাগ-সৃজিত কামিনী কুসুমে বিরহ কীট প্রবেশ করিয়া কি দুর্গতি করিতেছে, দেখ দেখ ঠাকুর! অনাথিনী বুঝি প্রাণে মরে, এ সময় তুমি না রক্ষা করিলে আর কে তাহাকে রক্ষা করিবে? দাও নাথ! অনঙ্গপালকে অনাথিনীর নিকটে আনিয়া, তাহা হইলে আবার উঠিবে, আবার মুদিত কমল ফুটিবে, আবার প্রেমভরে মাথা নাড়িয়া হাস্য আস্যে প্রণয়ীকে অশেষবিধ সুখ দানে আমোদিত

করিবে। তুমি নিদয় হইলে নিশ্চয়ই এলাবণ্যময়ী কুসুম শুখাইয়া যাইবে। কিন্তু বিধাতার কার্য্য অচিন্তনীয়, মানব তাহা বুঝিতে পারে না। মঙ্গলময় বিধাতা যাহা করেন, সকলই জীবের ভালর জন্য? প্রণয়ে যদি বিরহ না থাকিত, তাহা হইলে প্রণয়ের এত আদর হইত কি? না,কখনই না। বিরহই প্রেমের ভিত্তিস্বরূপ।

কাঙ্গালের দৈব সখা। এই নির্জ্জন স্থানে, ঘোরা যামিনী সময়ে কে আর অনাথিনীকে এ বিচ্ছেদবহ্নি হইতে শীতল করিবে কে তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিবে। ভুবন-জীবন জনশূন্য প্রদেশে সহায় হইয়া অনাথিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল অনাথিনী অনিল হিল্লোলে যেমন ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন, ক্রমশঃ তেমনি আবার শীতল হইতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাঁহার চৈতন্যের উদ্রেক হইল। ধীরে ধীরে ভূতল হইতে উঠিয়া পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন,—"আমি কি করিতেছি, প্রাণনাথ আমার বন্দী অবস্থায় কারাগারে অবস্থান করিতেছেন; আর আমি এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। তিনি যাইবার কালে আমি বলিয়াছিলাম,যে আপনার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে,-যবনগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। তবে কেন আর বৃথা কালব্যাজ করিতেছি। যখন পিতার কথা অবহেলা করিয়া, অনঙ্গের প্রেমানুরাগিণী হইয়াছি, তখন আর কিসের ভয়। বীর কন্যা বীরের ভাবী পত্নী হইয়া, পতির বিপদকালে সামান্য স্ত্রীলোকের মত হতাশ হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে পরকালে আমার পতিতা রমণীর ন্যায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে"। এই বলিয়া গাত্রোত্থান করত জীবনকিশোরের অশ্ব

শালাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথা হইতে একটী বেগবান অশ্ব বাছিয়া লইয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। অনাথিনী জীবনকিশোরের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পূর্ব্বেই স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে রাজপ্রাসাদহইতে বাহির হইবার সময় সংগ্রামোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রও সঙ্গে লইয়া কালীমন্দিরে আসিয়াছিলেন। অনাথিনী বীরবালা, বাল্যকালে অশ্বারোহণ করিতে শিখিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা এখন তাঁহার মহোপকার সাধন করিল। অনাথিনীর বর্ম্মাবৃত দেহ, হস্তে খরশান অসি, যেন কোমলে কঠিনের সংমিশ্রণ, এ দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। কামদেব! তোমার প্রবল ক্ষমতাকে ধন্য! তুমি যে গর্ব্বভরে এক সময় পিতামহ ব্রহ্মাকে উন্মত্ত করিয়া, সন্ধ্যার সহিত আসক্ত করিয়াছিলে.তুমি গর্ব্বভরে যোগেশ্বর বিশ্বসংহার কর্ত্তা পশুপতিকে এক সময় কাতর করিয়াছিলে তোমার সে প্রভাবকে শত ধন্যবাদ।কারণযেরমণী কস্মিনকালে বাটীরবাহির হন নাই, আজ সে তোমারই প্রভাবে অসাধ্য সাধনে দৃঢ় ব্রত হইয়াছে। তোমার তুল্য ক্ষমতাবান জগতে আর কে আছে?

পৃথিবীতে "প্রিয়বস্তু" বলিয়া যে বস্তুকে আখ্যাপ্রদান করা যায়, তাহার অশুভ সংবাদ শুনিলে কাহার না হৃদয় বিচলিত হয়? স্বামীর তুল্য প্রিয়বস্তু রমণীদের আর কি আছে। সতী স্ত্রীর পক্ষে স্বামী যে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়; তবে সতী অনাথিনী কেমন করিয়া তাঁহারই অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্থির থাকিবেন। প্রাণ যতক্ষণ, ততক্ষণ অনঙ্গপালের হিত আশে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পাঠক! অনাথিনীর প্রণয় পরীক্ষা করুন, এ প্রেম, এ পবিত্র প্রেম, এখানকার বস্তু নহে, এ পার্থিব বস্তু

নহে, এ অপার্থিব ধন অনাথিনী ভাল চিনিতেন। ঐন্দ্রিয়িক লালসা এবং মোহ এখানকার ভালবাসা—ঠিক মনের ভালবাসা নহে। সুন্দর বস্তু দেখিলে মনে স্বতঃই একটা অনুরাগ জন্মে, মানুষ ভ্রমে পড়িয়া তাহার বশবর্ত্তী হয়;—ইহা প্রকৃত ভালবাসা নয়, রূপজ মোহ মাত্র। জিহ্বাদ্বারা যেমন তিক্ত মিষ্ট প্রভৃতি রসাস্বাদন অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। নয়নে সুন্দর একটা বস্তু দেখিলে, অকস্মাৎ তেমনি ভালবাসা জন্মে। ভালবাসা দুই কারণে হইয়া থাকে—স্বাভাবিক সম্বন্ধে পিতামাতার মধ্যে এক ভালবাসা জন্মে, দ্বিতীয়তঃনানাবিধ গুণ দর্শনে যেমন বন্ধুর মধ্যে ভালবাসা জন্মে। অনাথিনীর ভালবাসা দুয়ের মধ্যে একটীও নয় নয়, ইহার ভালবাসা প্রাণের, বিদুষী সেনাপতিপুত্রী বাল্যকাল হইতে এ স্বর্গীয় পদার্থ চিনিয়াছিলেন—তাই তিনি ভালবাসার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিতা নন।

এদিকে অনপেক্ষণীয়া শর্ব্বরী শেষ—প্রভাত হইল। আমোদিনী কুমুদিনী মলিনা হইয়া গেলও বিরহিণী নলিনী,আগতপতি দিনমণি সন্দর্শনে কৌতুকিনী হইয়া বিকসিত মুখে হাস্য করিতে লাগিল। যাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি অধিক, তাহারই মুখে হাসি হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিরূপে মুখ হইতে বহির্গত হয় কিন্তু যাহার আনন্দ নাই—হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই—তাহার হাসি কোথায়? অনাথিনী চলিয়া গিয়াছেন, প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে একথা সরোজিনীর কর্ণে উঠিল স রাজিনী অনাথিনীর বিরহে অত্যন্ত কাতরা হইলেন। পরে জীবনকিশোর সরোজিনী র মুখে বীররমণী—অনাথিনীর বিষয় অবগত হইয়া, চারিদি কে সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

এ সংসারে অর্থ লইয়াই সব, অর্থই ইহসংসারের মূলমন্ত্র। চতুর্ব্বর্গ ধনের মধ্যে এখন অর্থই মানবের পরম ধন। এখন অর্থই স্বার্থ—স্বার্থই এখন ইষ্টমন্ত্র—তাই মূলমন্ত্র পরার্থপরতার সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। দীন দরিদ্র, রাজা প্রজা, অনাথ কাঙ্গাল সকলেই এক—সকলেই অর্থের দাস। অর্থে আত্মা কলঙ্কিত হয়, অর্থে মনের গতি সঙ্কুচিত হয়—অর্থ হইলে মন সৎপথে ধাবিত হয় না,—কলিতে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস গ্রহণ অর্থের জন্য, আচার্য্যের শিক্ষা দান অর্থের জন্য, রাজার রাজ্য আক্রমণ অর্থের জন্য। এক হিন্দু রাজা ব্যতীত সকলেরই রাজ্য আক্রমণ অর্থের জন্য ও তদানুষঙ্গিক বিলাসিতার জন্য, কিন্তু হিন্দুরাজাদের মূলমন্ত্র তাহা নহে;—হিন্দু শাস্ত্রে ইহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্রের রাজত্ব, প্রাতঃস্মরণীয় ধার্ম্মিক চূড়ামণি পাণ্ডুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব, ভগবদ্ভক্ত রাজা পরীক্ষিতের রাজত্ব, পরম দাতা মহারাজা বলির রাজত্ব, শুধু স্বার্থ কিম্বা অর্থের জন্য নহে। পরার্থপরতার সহিত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—যাহাতে মানবকে দেবতা করে। তাই তাঁহারা হিন্দুগণের পক্ষে প্রাতঃস্মরণীয় দেবতা।

আর এখনকার রাজারা সকলেই অর্থগৃধ্ন, সকলেই স্বার্থপর, প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ লাভ করাই ইহাদের রাজ্য শাসন। কি মুসলমান, কি ইংরেজ প্রকৃত রাজ্য শাসন কাহাকে বলে—তাহা আদৌ জানেন না।

দুরাত্মা মহম্মদ গজনবী হিন্দুর মর্ম্মে আঘাত করিয়া, সোম-নাথের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া, অশেষ ধন রত্ন লাভ করিয়া মনের আনন্দে স্বদেশ গমন করিলেন।

অনঙ্গপাল এখন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর কিছু সুস্থ হইয়াছে, এখন পদব্রজে দুর্গ হইতে বেড়াইয়া বেড়াইতে পারেন, কিন্তু একাকী নহে। কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইলে প্রহরীরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। সিংহ জালবদ্ধ হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়—বীরকেশরী অনঙ্গপালের সেই দশা হইয়াছে। পাঠক! বলিতে পারেন—অনঙ্গপাল এ অবস্থায় সুখী না দুঃখী। অনঙ্গপাল এ অবস্থায় সুখী নন! ক্ষত্রিয় বীর পরাধীন অবস্থায় সুখানুভব করিতে পারেন না। ইহা অপেক্ষা সমরে প্রাণত্যাগ করা বীরের পক্ষে অনন্ত সুখ, অনঙ্গপাল এখন নিরুপায়, নিরস্ত্র—নতুবা নীরোগ শরীর অনঙ্গপাল কি এই সামান্য কয়েক জন প্রহরীর অধীনে থাকিতেন?

মহম্মদ গজনবী আর এ দেশে নাই—এই প্রকৃত সুযোগ। এ ঘোর বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার হইবার মাহেন্দ্রযোগ, যদি বীরের সহায় একখানি অসি তাঁহার নিকট থাকিত।

অনঙ্গপাল কারাগারে বসিয়া নানা চিন্তায় মনকে উত্তেজিত করিতেছেন। আর এক একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতে

ছেন—"হা লাবণ্যময়ী! প্রাণোপমে! আর বুঝি তোমার সহিত দেখা হইলনা। আজীবন তুমি আমার আশায় রহিয়াছ, কিন্তু ভগবান তোমার সাধ পুর্ণ করিল না। ময়ি! তুমি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য পিতার কথা অবহেলা করিয়াছ, কত উপহাস সহ্য করিয়াছ, এমন কি পার্থিব সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আমার মঙ্গলের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিতেছ। কিন্তু তোমার সে অপরিমেয় প্রণয় ঋণ এ হতভাগ্য অনঙ্গপাল বুঝি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিল না। প্রাণোপমে! দেখা হউক আর নাই হউক, অনঙ্গপাল এ জীবনে কিন্তু তোমার পবিত্র স্মৃতি বিস্মৃত হইবে না। তোমার স্মৃতিই আমার এই অন্ধকারময় সংসারে আলোক স্বরূপ; তুমি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছ, বলিতে পারি না। কিন্তু যেখানেই থাক সুখে থাক, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, এই আমার আন্তরিক শেষ প্রার্থনা"। এই বলিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দিবা অবসান হইল। রজনীদেবী মন্থর গমনে আসিয়া ধরামাঝে আপন প্রভাব বিস্তার করিলেন। কাল রাত্রির আগমনে জীবগণ স্ব স্ব আবাসে, কুলায়, বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। কারাগারস্থিত অনঙ্গপালের নিদ্রা নাই,—যাহার সুখ নাই তাহার নিদ্রা কোথায়! সুখ ও শান্তি নিদ্রার আধার, শান্তিভাবাপন্ন ব্যক্তিকেই নিদ্রায় আক্রমণ করে! অনঙ্গের শান্তি ও সুখ যে দিন হইতে গিয়াছে, নিদ্রাদেবী ও সেই দিন হইতে কুমারকে ছাড়িয়াছেন, ভুলেও একবার তাঁহাকে কোলে লন না। অন্ধকারময়ী রজনী, কাহারও সাড়া শব্দ নাই।

চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ, প্রহরীগণের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই নিদ্রিত। এমন সময় অনঙ্গপাল দূর হইতে ঘোটকের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি মনে করিলেন—যবনদের কোনও সৈনিক পুরুষ দুর্গ দর্শনে আসিতেছে। ক্রমে শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল, সেই শব্দের সহিত মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত "কৈ কুমার, কৈ প্রাণের অনঙ্গ, দাসী প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে আসিয়াছে, তুমি বিদায় হইবার কালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে—সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় উপস্থিত, একবার সাড়া দাও, নতুবা আমি রমণী; এ স্থানের কিছুই জানি না, কেবল প্রতিজ্ঞা পূরণ জানি, আজ আমার জীবনের দুই প্রতিজ্ঞাপূরণ হইবে—একবার সাড়া দাও।"

একি! এ স্বর যে চেনা, এ কোকিলকণ্ঠ বিনিঃসৃত কণ্ঠস্বর যে অনঙ্গপালের প্রাণের সহিত সংবদ্ধ, এ স্বর কোথা হইতে আসিল। অনঙ্গপালের অতীত স্মৃতি-কাননের কোকিল কোথা হইতে আসিয়া, আবার মন মুগ্ধ করিল, জর্জ্জরিত প্রাণ শীতল করিতে এ মোহন স্বর কে আনিল? অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ঘটনা, অনঙ্গপাল কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন। সুদূর লাহোর প্রদেশস্থ সেনাপতি বিক্রমকেশরীর কেলিকাননস্থিত কোকিল আজ গোয়ালিয়রে তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে আসিয়াছে—ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? অনঙ্গপাল কারাগারে আবদ্ধ, বাহির হইয়া দেখিবার উপায় নাই, কি করিবেন, তথাপি গবাক্ষ খুলিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না;—সাড়া দিলেন,—"আমি বন্দী, বাহির হইবার উপায় নাই, অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি"। পুনরায়

প্রত্যুত্তর হইল—"দেবতার নিকট অভ্যর্থনার প্রত্যাশায় আসি নাই.—আশীর্ব্বাদ করুন, অস্পর্শীয় যবন হস্ত হইতে দেবতার উদ্ধার সাধন করি"।

প্রহরিগণ নিদ্রিত ছিল, বন্দীর কথোপকথন শুনিয়া সকলে জাগ্রত হইল। সশস্ত্র হইয়া প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ জন সৈন্য বাহির হইল। পরে কারাগারের দ্বার সমীপে আসিয়া দেখিল--নবযৌবন সম্পন্না. চারুচন্দ্র নিভাননা, হরিণ নয়না এক ললনা যোদ্ধৃবেশে কারাগার দ্বারে দণ্ডায়মান। পাঠক! অনাথিনীর বীরত্ব দেখুন, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কন্যাগণ স্বামীর জন্য কত কষ্ট সহ্য করিত, একবার পরীক্ষা করুন! সৈন্যগণ হিন্দু রমণীর এই অভূতপূর্ব্ব সাহস দেখিয়া, চমৎকৃত হইল এবং তাহাকে হস্তগত করিবার মানসে ধৃত করিতে গেল।

কিন্তু কাহার সাধ্য, তাঁহার পবিত্র অঙ্গস্পর্শ করে? অনাথিনী কি একাকিনী আসিয়াছেন—তাই যবনগণ তাহাকে পরাস্ত করিবে? দানবদলনী,—সতীসিমন্তিনী রণচণ্ডী কালী যে তাহাকে অভয় দিয়াছেন—অনাথিনী যে সতীধর্ম্মানুরাগিণী. তাঁহার বিনাশ কোথায়। এ সময় ত্রিলোকীতলে এমন বীর কে আছে যে তাহার সন্মুখীন হয়। মহম্মদ গজনবী ও তাহার সৈন্যগণ ত কোন ছার? প্রজ্জলিত শিখাবর্ত্তে যেমন পতঙ্গ পড়িবামাত্রই ভস্ম হয়। যবন সৈন্যগণ সতী রোষানলে পড়িয়া তদ্রূপ ভস্ম হইয়া গেল।

অনাথিনী যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পতির উদ্ধার সাধন করিলেন। বেগবতী স্রোতস্বতী সাগরে মিলিত হইল, অনাথিনী আজ নিজ বীর্য্যবলে সনাথিনী হইলেন। পাঠক! এ দৃশ্য বর্ণনা করা.

আমার সাধ্য নয়। অনঙ্গপাল ও লাবণ্যময়ীর এ মিলন বর্ননা-তীত। বিরহবিধুরা লাবণ্যময়ী ও আজীবন দুঃখ প্রপীড়িত অনঙ্গপাল এ অবস্থায় যে কি সুখী হইলেন—তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন?

অনঙ্গপালের আনন্দ আর হৃদয়ে ধরেনা, যাহা তিনি কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই; আজ তাহা চক্ষের উপর প্রতিফলিত হইল। অনঙ্গপাল আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন—প্রিয়! তোমারই জন্য আমি পুনরায় স্বাধীন হইলাম, আজ হইতে [illegible]—"অতুলনীয় বীররমণী লাবণ্যময়ীই আমার রক্ষাকর্ত্রী, এই অসীম বিপজ্জাল হইতে শুধু তোমার কৃপায় উদ্ধার হইয়া পুনরায় স্বাধীনতা সুখ লাভ করিলাম"। অনঙ্গ প্রাণা লাবণ্যময়ী নতাননে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"লাবণ্যময়ীর এ সকল সাহস, যাহা হইতে উদ্ধার হইলে—এ বলবীর্য্য কেবল তোমার কৃপায়! ইহাতে আমার নিজস্ব কিছু নাই। তোমার প্রতি যদি আমার আন্তরিক অনুরাগ না থাকিত, তাহা হইলে এ অসাধ্য সাধন আমার ন্যায় দুর্ব্বলা বালার সাধ্য নয়।" সতীত্বই সতীর বল বুদ্ধি ভরসা। সতীত্ববলে রমণী যে কতদূর অসাধ্য সাধন করে—তাহা হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিলে সকলই জানিতে পারা যায়। সাবিত্রী, দময়ন্তী, সত্যবতী, প্রভৃতি রমণীগণের কার্য্যকলাপ পাঠ করিলে, কে না বলিবে—তাঁহারা মানবী আকারে দেবী: অতএব সতীত্বই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম এবং সতীত্ব বলেই তাহারা জগতের পূজনীয়া, সতী স্ত্রীই পৃথিবীর অলঙ্কার। অনন্তর লাবণ্যময়ী পতিকে উদ্ধার করিয়া, উভয়ে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক [illegible]মোয়ারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে লাবণ্যময়ী

তাঁহার যাবতীয় বৃত্তান্ত কুমারকে অবগত করাইলেন, কুমারও তৎসংক্রান্ত ঘটনা সকল লাবণ্যময়ীকে জ্ঞাপন করিলেন। উভয়ে এইরূপ নানাবিধ সুখ দুঃখের কথোপকথন করিতে করিতে, প্রাণের বন্ধু জীবনকিশোর ও সরোজিনীর আশ্রয়ে গমন করিলেন। বহুদিন অদর্শনের পর অসহ্য বিরহের পর এ মিলনে প্রেমিক প্রেমিকার কত সুখ, কত আনন্দ, প্রেমিক পাঠক। একবার অনুমান করুন!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—○॰○—

দুর্গতি।

রাজা বিজাতীয় হইলে, সে রাজ্যের প্রজাবর্গের কষ্টের এক-শেষ হয়,—প্রজাদের উপর রাজার বিশ্বাস থাকে না, রাজার উপরও প্রজাপুঞ্জের বিশ্বাস থাকে না। রাজা ও প্রজা উভয়েই সশঙ্কিত থাকে। কখন কি অনিষ্ট সাধন করে—এই তাহাদের ঘোর দুর্ভাবনা। কারণ তাহাতে প্রকৃত সম্বন্ধ কিছু নাই, জাতীয় [illegible] তাহাতে প্রবাহিত নাই। যাহার সহিত বাহিক সম্বন্ধে [illegible] প্রভেদ, তাহার সহিত কিসের সম্বন্ধ, কিসের বিশ্বাস? বিশ্বাস আন্তরিক পদার্থ, যাহার বাহিক বিষয়ে ঐক্য নাই, তাহার আন্তরিক বিষয়ে ঐক্য হওয়া কি সম্ভবপর? মহম্মদ গজনবীর [illegible] দিনের বিশ্বাস সমস্তই নষ্ট হইল, অনঙ্গপালের পলায়ন [illegible] ষড়যন্ত্র কেবল বিক্রমকেশরীর দ্বারা হইয়াছে। এই স্থির করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে [illegible] দিলেন;—বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মাকে প্রাণে মারিও না। বন্দী করিবার চেষ্টা করিবে, অনঙ্গপালের বিনিময়ে তাহাকেই কারাবদ্ধ করা উচিত, তৎপরে অন্য চেষ্টা। দুরাত্মা অনঙ্গপালের [illegible] সিংহাসন লাভ করিবার মানসে তাহাকে দেশত্যাগী করিয়াছিল—নিশ্চয়ই ইহা তারই ইঙ্গিত অনুসারে হইয়াছিল। এইরূপ বলিয়া সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন।

বিক্রমকেশরীর সমস্ত সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। বিক্রমকেশরী মনে করিয়াছিলেন, এইবার রাজা হইলাম, কিন্তু তাহা হইবার নহে; পাপের পথে আশু উন্নতি বটে, কিন্তু সে কদিন, সে ক্ষণস্থায়ী। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপের সঞ্চয়ে অশেষ দুর্গতি।

সৈন্যগণ লাহোরে আসিয়া জয়পালের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া বিক্রমকেশরীর অন্বেষণ করিল। কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। তাহারা জানিতে পারিল, বিক্রমকেশরী তাহাদের আগমন সংবাদ শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই পলায়ন করিয়াছেন। হতাশ হইয়া সৈন্যগণ মহম্মদ সমীপে প্রস্থান করিল॥

লোভেই পাপ,—পাপেই মৃত্যু। তাই আমাদের হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—"অতি লোভং ন কর্ত্তব্য, লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ, অতি লোভাভিভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে।" লোভের বশবর্ত্তী হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধর্ম্ম পথে ধাবিত হইয়া,যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বিক্রমকেশরীর সেই পাপে তাহার পরিণামে অনন্ত দুর্গতি হইল। পরিণাম বিবেচনা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া কার্য্য করিলে উন্নতি হয় না। লাবণ্যময়ীকে যে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাহার প্রতিফল ফলিল।

সতীকে মনোবেদনা দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া গুপ্তভাবে পলায়ন, ও লাঞ্ছনার একশেষ।

সতী রোষানল এমনি অমোঘ, ইহা হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।—সাবধান! কেহ সতীর অহিতাচরণ করিও না।

—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০০০—

অমানুষিক ত্যাগস্বীকার।

লাবণ্যময়ী পতিকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় পেসোয়ারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পূর্ব্বে লাবণ্যময়ী অনাথিনীর ন্যায় জীবনকিশোরের রাজত্বে বাস করিতেন—সকলেই তাঁহাকে দীনহীন ভিখারিণী বলিয়া জানিতেন,—আজ হইতে সকলের সে মোহ ঘুচিল, অনাথিনী যে সামান্য রমণী নন্—তাহা বিশ্বাস হইল। জীবনকিশোর ও রাণী সরোজিনী এখন জানিতে পারিয়াছেন—অনাথিনী কে?

জীবনকিশোর অত্যন্ত ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন. লাবণ্যময়ীর এতাদৃশ পতিভক্তি ও পতি অনুরাগ দেখিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। লাবণ্যময়ীর সহিত পূর্ব্বে সে তাহার পরিণয় সম্বন্ধ হইয়াছিল, সে বিষয় মনে করিয়া তাহাদের প্রতি রাগান্বিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রবুদ্ধ হইয়া মনে মনে বলিলেন—"স্বর্গের অমৃত কি বায়সের উপভোগ্যা হইতে পারে?" আজ হইতে অনঙ্গপাল ও লাবণ্যময়ীকে তাঁহারা উভয়ে দেব দেবীর ন্যায় মান্য করিতে লাগিলেন।

একদিন জীবনকিশোর অনঙ্গপালের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—"মহাশয়! আমার একটী বক্তব্য আছে. অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে বড় বাধিত হইব?"

অনঙ্গপাল জীবনকিশোরের এতাদৃশ বিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"ভাই! এই স্বার্থপর পৃথিবীতে তোমার ন্যায় পরম

বন্ধু আমার কে আছে! তুমি এতদিন আমার লাবণ্যময়ীকে আশ্রয় দান করিয়া যে কত উপকার করিয়াছ—তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। ভাই! তুমি আমার উপকারক ও অসময়ের সহায়। তোমার কি এরূপ বিনয় বাক্য প্রয়োগ করা আমার নিকট ভাল দেখায়। যা বলিতে হয় ভাই! নিঃসন্দেহে বল, তোমার কথা অবহেলা করা আমার সাধ্য কি?” জীবনকিশোর এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—“আমার এবং সরোজিনীর আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, যতদিন না আপনার স্বরাজ্য উদ্ধার হয়, ততদিন আপনি এই পেসোয়ার রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রজা পালন করুন। লাবণ্যময়ীর পতি অনুরাগ দেখিয়া আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। আপনার ন্যায় স্বদেশহিতৈষী ক্ষত্রিয়কুমার ও আপনার পত্নীর ন্যায় পতিব্রতা, অবনীমণ্ডলে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনাদের হিতার্থে আমি সামান্য রাজ্য দান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না,—আমার জীবন দান করিলেও যদি আপনাদের ন্যায় সতী ও সতীপতির মঙ্গল হয়, তাহা আমি অকাতরে করিতে পারি।” তদনন্তর স্মিতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন,—একবার পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন, আমি আপনার খুল্লতাত পুত্র, আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এই বলিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

অনঙ্গপাল পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,—ভাই জীবনকিশোর! তুমিই আমার প্রাণের ভাই বাদল। লীলাময়! বলিহারি যাই তোমার লীলা খেলায়! হে চতুর খেলুয়াড়! যোগীগণ যুগ যুগান্তর তপস্যা করিয়াও যে খেলার অন্ত পায় না, আর আমি সামান্য ব্যক্তি

হইয়া সে অভাবনীয় বিষয় কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব।” আমরা দেখিতে আসিয়াছি, অবাক হইয়া কেবল তোমার খেলা দেখি—আর তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। এই বলিয়া জগদীশ্বর চরণে প্রণাম করিলেন।—পরে বলিলেন,—ভাই! সে ভয়ানক বিপদ হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার হইলে?

জীবনকিশোর অনঙ্গপালের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন। ৯৯১ অব্দে রাষ্ট্র বিপ্লবের কথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে, দুরাত্ম-দস্যুগণ বিনায়াসে আমার সুষুপ্ত পিতামাতারপ্রাণ সংহার করিলে, আমার ধাত্রী আমাকে লইয়া সেই রাত্রে পলায়ন করিয়া এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লন, পরদিন সে আমায় লইয়া কাশ্মীর গমন করে; তথায় মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পেসোয়ারে রাজ্য স্থাপন করি। আমার পরিণয় সম্বন্ধে সকল কথা লাবণ্যময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। সে বিবাহে নৈরাশ হইয়া পরে ৩।৪ মাস গত হইল কাণ্যকুব্জ হইতে পুনরায় এই বিবাহ করিয়াছি। এখন আপনাদের উভয়কে একত্র রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলে আমার সকল বাসনা পূর্ণ হয়। অনঙ্গপাল কনিষ্ঠের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। পেসোয়ারের রাজ সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। পাঠক! আর বিবাহের আড়ম্বর করিতে হইবে কি? অনঙ্গপালের সহিত লাবণ্যময়ীর বিবাহ—ইহার আর বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। আত্মায় আত্মায় সম্মিলনের নাম বিবাহ। লাবণ্যময়ীর হৃদয়ের সহিত অনঙ্গপালের হৃদয়ের কত ঐকতা, তাহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন তবে

আর পুনর্মিলনের আবশ্যক কি? অনঙ্গপাল রাজা হইলেন, লাবণ্যময়ী পাটরাণী,—অপূর্ব্ব মিলন। জীবনকিশোর জ্যেষ্ঠ, ভ্রাতাকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, আপনি রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। সারাজিনীও লাবণ্যময়ীকে আপনার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় মান্য করিতে লাগিলেন।

লাবণ্যময়ীর দুঃখ নিশি প্রভাত হইল। তিনি কনিষ্ঠ দেবর জীবনকিশোর ও সরোজিনীকে প্রাণের তুল্য ভাল বাসিতেন লাগিলেন। রাজা ও রাণীর সদাশয়তাগুণে রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইল, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। লাবণ্যময়ী বৃদ্ধ তারাচাঁদের উপকারের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাহার ভাগ্যাকাশে সুখ সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারাচাঁদের দুর্গতি নাশ হইল সে পুনরায় লাবণ্যময়ীর অধীনে আসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ধর্ম্ম চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

উপসংহার।

—:০:—

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল। গ্রন্থ শেষে কেবল বিক্রমকেশরীর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

পাপীর উদ্ধার শীঘ্র হয়, কৃত পাপের বিষয় অনুশোচনা করিয়া অনুতাপ করিলে, তাহার সদ্গতি ধ্রুব নিশ্চয়, ভগবান তাহার প্রতি অনুকূল হন; তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া মুক্তি পথের পথিক করেন। ঈশ্বর পাপীকে বড় ভালবাসেন—কেন না, পাপী অত্যন্ত দুঃখী, যতই কেন সুখী হইবার চেষ্টা করুক, অন্তঃস্থল কিছুতেই শান্তিভাবাপন্ন হইবে না, চিরকাল রাবণের চিতার ন্যায় পুড়িয়া যাইবে। জগতে পাপীর তুল্য দুঃখী আর কেহই নাই, তাহাদিগকে কেহ ভাল বাসে না, পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। কিন্তু সকলে যাহাকে ঘৃণা করে, ভগবান তাহকে নিশ্চয় দয়া করিয়া থাকেন তাহা না হইলে পৃথিবীতে তাহার দাঁড়াইবার স্থল কৈ? এই জন্য প্রভু চৈতন্য দেবের কৃপায় মহাপাপী জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়া ছিল। অতএব অনুতাপ করাই পাপনাশের একমাত্র উপায়। যদি কেহ কখন ভুলক্রমে পাপ সঞ্চয় করিয়া থাক, তাহার জন্য অনুতাপ কর, নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইবে।

সংসারের ধনে মানুষকে কাঁদায় ভিন্ন হাসায় না। যে রাজ্য ধন এক সময়ে বিক্রমকেশরীকে অশেষ সুখ দান করিয়াছিল, এখন সেই রাজ্য হইতেই আবার কাঁদিতে হইল। তারপর বিক্রমকেশরীকে প্রয়াগতীর্থে সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতি-

পাত করিতে দেখা গিয়াছিল। ভিক্ষাবৃত্তিই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা হইয়াছিল; রাজ্য ধন অপেক্ষা ইহাতে তিনি অপরিসীম সুখানুভব করিতেন। সদাসর্ব্বদাই যে বিক্রমকেশরীকে দেখিলে সকলের ভয় হইত, যাহাকে দেখিলে পাপের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহাকে দেখিলে ভয় পরের কথা বরং ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে, ধর্ম্মের এমনি মহিমা! এ ধন চিরকাল স্পর্শমণি হইয়া জীবনকে অনন্ত শান্তিসুখে কৃতার্থ করে ঘোর পাষণ্ডগণের অন্তঃকরণে অতিশীঘ্রই অনুরাগাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সমস্ত পাপ রাশিকে ধ্বংস করে,পাপ ধ্বংস হইলেই মানব মুক্তিপথের পথিক হয়, তখন তাহার আর বাহ্যবিষয়ে অনুরক্তি থাকে না। তখন কোপীন পরিধান করিয়া দিনান্তে একমুষ্টি ভিক্ষান্ন লাভ করিলেও মহাসুখ। এ অতুল আনন্দ অর্থের দ্বারা পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করিলে, ধর্ম্মানুরাগী হইলে, এই সুখের উদয় হয়—ইহাই নিত্যসুখ; এবং তাহার তুল্য মনুষ্য, যারপরনাই ভাগ্যবান; পরম জ্ঞানী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার "কৌপীনপঞ্চক" নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে লিখিয়াছেন;—

> বেদান্তবাক্যেষু রমন্তো
> ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ
> অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ,
> কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বিক্রমকেশরীর সমস্ত বিষয়ই এই শ্লোকের সহিত ঐক্য হয় কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ এখন অশোক হয় নাই। অন্তঃকরণ

সময়ে সময়ে স্নেহের কন্যা লাবণ্যময়ীর জন্য কাতর হয়। তাঁহার জন্য লাবণ্যময়ীর যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছিল—এই কথা যখন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন একবারে মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। বিক্রম লোকমুখে শুনিয়াছিল যে, লাবণ্যময়ী অনঙ্গপালকে বিবাহ করিয়া পেসোয়ারে মহারাণী হইয়াছেন। জীবনকিশোরের সহিত অনঙ্গপালের ভ্রাতৃ সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিয়া, ও তাহার অমানুষিক ত্যাগ স্বীকারের বিষয় অবগত হইয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

লাবণ্যময়ী অতুল ধনের অধীশ্বরী হইয়া, পিতামাতার বিষয় ভুলিয়া যান নাই। রাজ্য প্রাপ্তির পরে পিতামাতার অন্বেষণ করিয়াছিলেন। প্রয়াগের যাত্রীগণের মুখে পিতা মাতার দুঃখের বিষয় শুনিয়া লাবণ্যময়ী তাঁহাদিগকে রাজ্যে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিক্রমকেশরী পুনরায় কোন মুখে আসিয়া জামাতা ও কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। লোকে তাঁহাকে কি বলিবে,—আর জীবনকিশোরই বা কি মনে করিবে। এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি কন্যার কথায় সম্মত হইলেন না। লাবণ্যময়ী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন শেষে কিছুতেই স্বীকৃত করিতে না পারিয়া, যাহাতে তাঁহাদের কষ্ট না হয়, তাহার বন্দোবস্ত ও মাসিক দুইশত টাকা দীন-দুঃখিগণকে দান করিবার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

বিক্রমকেশরীকে এ সুখ অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। কেবল একবৎসর কাল কন্যা-প্রদত্ত বৃত্তিভোগ করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। পতিপ্রাণা রমণী—লাবণ্যজননী সহগামিনী হইয়াছিলেন। প্রয়াগে মাঘ মেলার সময় তাঁহার

মৃত্যু হয়। মৃত্যু সময়ে তাঁহার কোন দুর্গতি হয় নাই। সতীর অবমাননা করিয়া দক্ষপ্রজাপতি যেমন অশেষ ক্লেশও পরিণামে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, বিক্রমকেশরীও তদ্রূপ বহুবিধ ক্লেশ ভ পরিণামে শান্তিলাভ করিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন পাঠক! বল দেখি ইহা কাহার গুণে? সকলেই বলিবেন— লাবণ্যময়ীর গুণে, লাবণ্যময়ীর ন্যায় সতী স্ত্রীর পিতা হইয়াই, তাঁহার সদ্গতি লাভ হইল।

আসুন, আমরা লাবণ্যময়ীর মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করি।

সম্পূর্ণ।